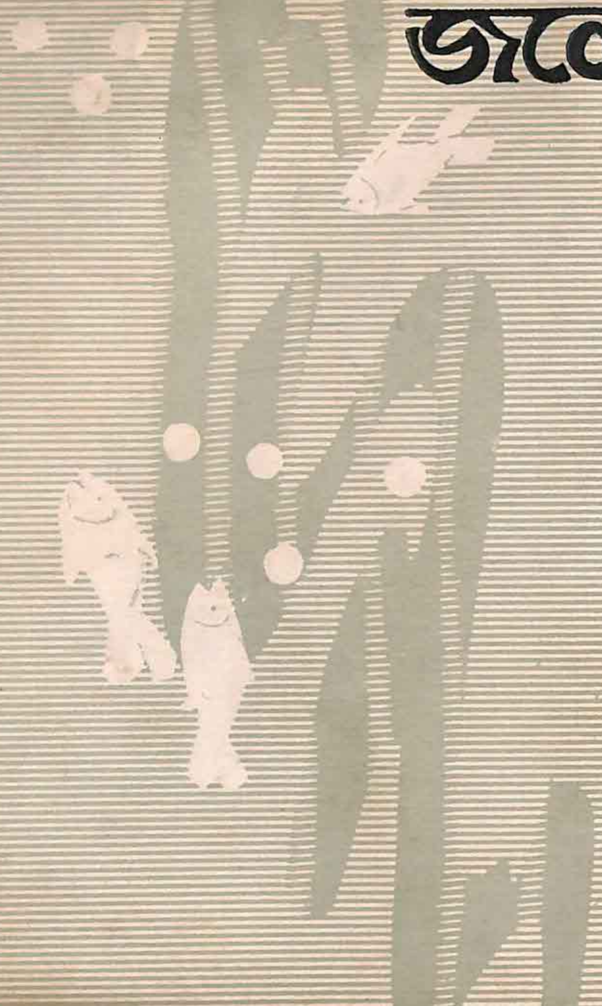
জলের কথা : অতুল চন্দ্র রক্ষিত



জলের কথা

প্রতুল চন্দ্র রক্ষিত

শরৎ বুক হাউস, কলিকাতা

'বিজ্ঞান-কথা' সংগ্রহ ২

প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৯১ সন

প্রচ্ছদ : শান্ত দত্ত

মূল্য : দশ টাকা

প্রকাশক : অমর দে

শরৎ বুক হাউস

১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর : টি. ঘোষ, 'লিপিমালী' প্রেস, ২জি, নীলমণি মিত্র রো, কলিকাতা-২

বাবি,

তখন তুমি খুব ছোট ছিলে। পুরী থেকে ফিরে এসে প্রশ্ন করেছিলে, "বাবা, সমুদ্রে এত জল কোথা থেকে এল? আর এত নুন কেন?" তোমাকে কিছু কিছু উত্তর দিয়ে বলেছিলাম, "তুমি যখন আরও বড় হবে তখন ভাল করে বলে দেব, সব বুঝতে পারবে।"

সে সুযোগ আর পাইনি। হঠাৎই একদিন তুমি চলে গেলে। তারপর অনেক দশক কেটে গেল, আমিও এখন তোমাদের কাছে পাড়ি দেবার জন্য খেয়াঘাটে অপেক্ষা করছি। তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তাই তোমার প্রশ্নের উত্তর লিখে রাখলাম।

—বাবা

এই বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ে অনুজপ্রতিম অধ্যাপক বেদুইন চক্রবর্তী কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। তার কাছে আমি সত্যিই ঋণী। কল্যাণীয়া মালবিকা চৌধুরী কয়েকটি ছবি এঁকে দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে— তাকে আমার সস্নেহ আশীর্বাদ জানাই। আর প্রকাশনার ব্যাপারে অধ্যাপক অমর দে-র সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এ বই বের হত না—তাকে আমার অশেষ ধন্যবাদ।

—গ্রন্থকার

জলের কথা

জলের কথা

জলের সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতা এত বেশী যে জলের সম্বন্ধে আমাদের মনে সহসা কোন কৌতূহল জাগে না। ঘরের কলসীতে জল, জল বাইরের বৃষ্টি-ধারায়, দীঘি-পুষ্করিণী জলে টলমল, নদনদীতে জলের স্রোত—জলের এই বহুধা বিস্তারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এত সহজ ও সাধারণ যে পৃথিবীর বুকের জীবন-প্রবাহে জলের অসামান্য অবদানের কথা আমাদের মনেই আসে না। আমাদের বেঁচে থাকার মূলে যে জলের এক প্রধান ভূমিকা রয়েছে সে বিষয়ে আমরা সাধারণতঃ সচেতন নই।

নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল জলের মাধ্যমে। সেই সুদূর অতীত থেকে সর্বচরাচরে জলই জীবনকে লালন করেছে। জল ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কি জীবকোষ, কি উদ্ভিদকোষ, যেখানেই প্রাণের স্পন্দন, সেখানেই জলের প্রয়োজন। বাতাসের মতই জলও প্রাণধারণের জন্য অপরিহার্য। তাই জলের অপর এক নাম জীবন। জল প্রাণস্বরূপ, তাই পুরাকালের ঋষিদের কাছে জল ছিল উপাস্য।

আমাদের দেহেতেই রয়েছে প্রচুর জল! শরীরের রক্ত, মাংস, মজ্জা সব কিছুরই অনেকাংশ জল; মানবদেহের মোটামুটি দুই-তৃতীয়াংশই জল। শুধু মানুষ কেন, অন্যান্য জীবদেহে, গাছপালা, ঘাসপাতা, শাক-সবজী সবার মধ্যেই অনেকটা অংশ জল। একটা পাতা ঝরে পড়ে যখন শুকিয়ে যায়, তখন তার ওজন যায় কমে, কারণ সেটা থেকে জল উবে যায়। আমরা জলের চাহিদা মেটাই সরাসরি জল পান করে অথবা নানা খাদ্য আর পানীয়ের সঙ্গে। আর গাছপালা জল সংগ্রহ করে মাটি থেকে শিকড় দিয়ে টেনে নিয়ে। জলের সঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য, জল পৃথিবীতে না থাকলে জীবজগতের অস্তিত্বই থাকত না। চাঁদে জল নেই, নেই জল শুক্রগ্রহে, তাই সেখানে এরকম প্রাণেরও বিকাশ ঘটেনি। পৃথিবীর বুকেও যেখানেই জলের অভাব সেখানেই গাছপালা নেই, জীব-বাসের অযোগ্য সব মরু অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন দেখা যায় বিস্তীর্ণ সাহারাতে বা আরব মরুপ্রান্তরে।

১। জলের উৎস

জল বললে তরল জলের কথাই আমাদের মনে আসে। তরল পদার্থকে তাপ দিলে সেটা গ্যাস হয়ে যায়, আবার শীতল করলে তরল বস্তু কঠিনাকার ধারণ করে। জলেরও তাই হয়। বস্তুতঃ পৃথিবীতে জল তিন রকমেই রয়েছে ঃ কঠিন, তরল এবং বাষ্পাবস্থায়। দৈনন্দিন কাজে আমরা জলের চাহিদা মেটাই নদী, পুকুর বা কুয়ো থেকে। কিন্তু তরল জলের প্রধান ভাণ্ডার হচ্ছে সাগর, মহাসাগর ; তারপর হ্রদ, নদনদী, দীঘি, সরোবর এসব। এছাড়া ভূপৃষ্ঠের নীচেও আবদ্ধ হয়ে আছে যথেষ্ট জল। ভূপৃষ্ঠের জমিতে যেখানে শস্য জন্মায়, সেখানেও খানিকটা জল বিধৃত আছে।

মহাসাগর, হ্রদ, নদনদী ইত্যাদি জলাশয় থেকে সৌরতাপে জল নিরন্তর বাষ্পায়িত হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সুতরাং জলীয় বাষ্পের আবাস হচ্ছে বায়ুমণ্ডল। মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বা ঘামের সঙ্গে যে জল বেরিয়ে আসে, তাও বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। গাছের পাতা থেকেও বাতাসে জলীয় বাষ্প আসে। বাতাসের জলীয় বাষ্প থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদি। "বাতাসের কথায়" এই জলীয় বাষ্পের বিষয় অনেক আলোচনা করা হয়েছে, পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

জল জমে বরফ হয়ে যায় 0°C তাপমাত্রায়—জলের হিমাঙ্ক এই উষ্ণতা। পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে তাপমাত্রা এর চেয়ে কম সেখানে স্বভাবতঃই জল কঠিনাকারে থাকবে। এই কারণেই বরফ বা তুষারস্তূপ প্রধানতঃ দুইটি অঞ্চলে বিশেষ করে দেখা যায় ঃ (১) মেরু-অঞ্চলে আর (২) বড় বড় পর্বতের উচ্চ শিখরে। বায়ুমণ্ডলের উঁচু স্তরে যেখানে ঠাণ্ডা হয়ে জলবাষ্প মেঘে পরিণত হয়, সেখানেও অতিশীতলতার জন্যে খানিকটা বাষ্প জমে তুষারকণায় পরিণত হয়, অর্থাৎ কঠিনাকারে থাকে।

ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশই ত সমুদ্র মহাসমুদ্র দিয়ে জলাবৃত। হিসাব করে দেখা গেছে বছরে গড়ে প্রায় 5300 কোটি ঘনফুট জল এই সব জলাধার থেকে বাষ্পায়িত হয়ে বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। এই বাষ্পের ওজন হবে 150 কোটি টন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যে জলরাশি বাষ্পীভূত হয়ে চলে যায়, বৃষ্টি, নদীনালার প্রবাহ দিয়ে আবার সাগরের সে ক্ষতির পূরণ হয়ে থাকে।

জল কি পরিমাণে বিভিন্ন অবস্থায় পৃথিবীতে রয়েছে তার একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া যেতে পারে ঃ—

	আয়তন, সহস্র ঘন কিলোমিটার	জলের মোট শতাংশ (%)
সমুদ্রের জল	1370000	93.93
ভূপৃষ্ঠের নীচে আবদ্ধ জল	60000	4.12
তুষার ও হিমবাহ	24000	1.65
হ্রদ ইত্যাদি	230	0.016
নদীর জল	1.2	0.0001
জমিতে বিধৃত জল	80	0.005
বায়ুমণ্ডলের বাষ্প	15	0.001
মোট	~1454326	100

২। তুষার-কাহিনী

উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুদেশ আর তাদের সন্নিহিত অঞ্চল চিরতুষারাবৃত স্থায়ী বরফের রাজ্য। পৃথিবীর কঠিনাকার জলের অধিকাংশই রয়েছে এই দুই মেরুপ্রান্তে। বস্তুতঃ এরা জনমানবহীন, গাছপালাশূন্য বরফের মরুভূমি। উত্তরমেরুর কাছে গ্রীনল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশে তবু কিছু এস্কিমোর বাস আছে, দক্ষিণমেরুতে তাও নেই। দক্ষিণমেরুর তুষারপ্রান্তে কখনও কখনও সামান্য শৈবাল ও ছত্রাক শুধু দেখা যায়। কল্পনাতীত এই তুষার-স্তূপের বিস্তার আর বিশালতা। অ-লবণাক্ত জলের তিন-চতুর্থাংশই—তিন কোটি ঘন কিলোমিটার—এমনি করে তুষারে বন্দী হয়ে আছে। পৃথিবীতে ষাট বছরে যে পরিমাণ বৃষ্টি ও তুষারপাত হয়—এই আবদ্ধ বরফ পরিমাণে তার সমান। অনেক সময় নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সমুদ্রবক্ষে, বিশেষতঃ আটলাণ্টিক মহাসাগরে, প্রকাণ্ড সব ভাসমান তুষারের স্তূপ দেখা যায়। এদের নাম "আইসবার্গ" (Iceberg) বা হিমশৈল। আইসবার্গের সব চেয়ে বড় কারখানা গ্রীনল্যাণ্ডে। গ্রীনল্যাণ্ডের সবটাই বরফাবৃত, অন্ততঃ 1025000 বর্গ কিলোমিটার; উত্তরাংশের বরফ প্রায় দুই হাজার মিটার পুরু। এখান থেকে বড় বড় বরফের চাঁই সমুদ্রে নেমে আসে এবং দক্ষিণদিকে ভেসে যেতে থাকে। প্রতি বছরে অন্ততঃ একশ কোটি টন আইসবার্গ এক গ্রীনল্যাণ্ড থেকেই বেরিয়ে আসে। অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর জলের সংস্পর্শে এসে ছোট ছোট আইসবার্গ গলে যায়, কিন্তু বড়গুলো অনেকসময় প্রায় হাজার মাইল পর্যন্ত চলে আসে। জাহাজ চলাচলে এরা এক মহাবিভীষিকার সৃষ্টি করে। এই ভাসমান তুষারস্তূপগুলির এক-অষ্টমাংশ মাত্র জলের উপরে থাকে। বাকীটা জলের নীচে। তিন চারতলা দালানের সমান উঁচু এবং হাজার ফিটেরও বেশী লম্বা আইসবার্গও দেখা গেছে। 1912 সালের ১৪ই এপ্রিল সেদিনের বিশালতম বিখ্যাত ব্রিটিশ জাহাজ "টাইটানিক" এরকম একটা

আইসবার্গের সংঘর্ষেই নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। দেড় হাজার যাত্রীর সলিল-সমাধি হয়েছিল।

একদিকে সাইবেরিয়া, অপরদিকে কানাডার উত্তরের দ্বীপপুঞ্জ দিয়ে বেষ্টিত উত্তর-মেরু ঘিরে যে বিস্তীর্ণ জলভাগ সেটাই উত্তর বা সুমেরু মহাসাগর। এর প্রায় সবটাই বরফ দিয়ে ঢাকা। এই তুষার-রাজ্যের তাপমাত্রা গড়ে −76°F-এরও নীচে। এই দুরধিগম্য মেরুরাজ্যে অভিযান আরম্ভ হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকেই। এসমস্ত অভিযানের ইতিহাস মানুষের কষ্টসহিষ্ণুতার, অধ্যবসায়ের, দুর্জ্ঞেয়কে অধিগত করার দুর্নিবার ইচ্ছা ও দুঃসাহসের পরিচয়। সেই ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। এই মেরু-অভিযানে যাঁদের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন : ফ্র্যাঙ্কলিন (1845), রস (1848), ম্যাকক্লিওয় এবং ম্যাকক্লিনটক (1850) ইত্যাদি। এরপর 1903-এ বিখ্যাত অভিযাত্রী অ্যামুণ্ডসেন মেরুর খুব কাছে পেঁাছেছিলেন, কিন্তু সর্বপ্রথম উত্তরমেরুতে পেঁাছান আমেরিকার কম্যাণ্ডার রবার্ট পিয়ারী ; তারিখটা এপ্রিল 6, 1909।

এরপর 1926-এ আমেরিকার অ্যাডমিরাল রিচার্ড বায়ার্ড এবং ফ্লয়েড বেনেট প্লেনে করে গিয়ে উত্তরমেরুতে পেঁাছেছিলেন। 1958-এ পারমাণবিক ডুবোজাহাজ তুষারের তলা দিয়ে গিয়ে উত্তরমেরুতে উপস্থিত হতে পেরেছে।

একসময়ে মনে করা হত, উত্তরমেরুর মত দক্ষিণমেরু ঘিরেও রয়েছে এক বিরাট মহাসাগর, দক্ষিণ মহাসাগর। কিন্তু এখন জানা গেছে দক্ষিণমেরুতে রয়েছে এক বিশাল স্থলভাগ, বাস্তবিকপক্ষে এক মহাদেশ। এই মহাদেশের নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাণ্টার্কটিকা—Antarctica। এর বিস্তার ষাট লক্ষ বর্গমাইলেরও বেশী, অর্থাৎ সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের একত্রে যে বিস্তার তার চেয়েও বড়। কিন্তু এই মহাদেশের সবটাই কয়েক হাজার মিটার বরফের তলায়। এখানকার তাপমাত্রা উত্তরমরুর চেয়েও কম। উত্তরমেরুর তুলনায় দক্ষিণমেরুর অভিযান আরও কষ্টকর। দক্ষিণমেরুর প্রথম অভিযাত্রী ছিলেন ফরাসী নৌ-সেনানী পিয়েরে বুভে (1739)। তারপর 1774-এ কুক 70° দঃ অক্ষাংশ পেরিয়েও খানিকটা অগ্রসর হয়েছিলেন। রস (1842) আরও খানিকটা এগিয়ে 78° 10′ দঃ অক্ষাংশে পেঁাছে এক বিরাট উঁচু বরফের পর্বতে বাধা পান, আর অগ্রসর হতে পারেন নি। 1902 সনে ক্যাপ্টেন স্কট 82° 17′ দঃ অক্ষাংশে মেরু থেকে 463 মাইল দূরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করে তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল। অভিযাত্রী-ইতিহাসে স্কটের এই অভিযানের কাহিনী নানাদিক দিয়ে অবিস্মরণীয়। এরপর স্যাকেলটন (1909) আরও এগিয়ে মেরু থেকে প্রায় 97 মাইল দূরে হাজির হয়েও রসদ এবং খাদ্যের অভাবে ফিরে আসতে বাধ্য হন। উত্তরমেরুর কাছে তবু বল্গা হরিণ, সামুদ্রিক সীল, ও অন্যান্য কিছু মাছ পাওয়া যায়, খাদ্যরূপে সেসব ব্যবহার করা যায়। অ্যান্টার্কটিকার বাইরের সমুদ্রে তিমি, সীল প্রভৃতি থাকলেও মেরুঅঞ্চলে এসব কিছুই নেই, তাই সমস্ত খাবার ও পানীয় সঙ্গে নিতে হয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সমস্ত রসদ নিয়ে

বরফের উপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যে কি দুঃসহ তা বর্ণনাতীত। এর পর ক্যাপ্টেন রোয়াল্ড অ্যামুণ্ডসেন দক্ষিণমেরুতে প্রথম পদার্পণ করেন—ডিসেম্বর 14, 1911। অন্য একটি পথ ধরে একমাস পরে স্কটও গিয়ে দক্ষিণমেরুতে উপস্থিত হন —জানুয়ারী 17, 1912 ; কিন্তু গিয়ে দেখেন অ্যামুণ্ডসেন তাঁর আগেই পেঁাছে গিয়েছেন। স্কট আর তাঁর সহকর্মীরা ফিরে আসতে পারেন নি, এক দুর্যোগে প্রাণ হারান। 1958-এ সার ভিভিয়ান ফুক্‌স্ অ্যাণ্টার্কটিকা মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পাড়ি দেন দক্ষিণমেরুর মধ্য দিয়ে (2158 মাইল)। দক্ষিণ-মেরুতে গিয়ে তিনি স্যার এড্‌মণ্ড হিলারীর সঙ্গে মিলিত হন।

অ্যাণ্টার্কটিকার তুষার-রাজ্যে দুঃসহ শীত ত আছেই, তার উপর দিনের পর দিন হিমশীতল তীব্র ঝড়ো-হাওয়া বয়ে যায়। এ ছাড়া বরফ থেকে ঠিকরে-আসা চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর জ্যোতিতে অন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। শীত এত তীব্র যে কয়েকবার চোখ মিটমিট করলে চোখের পাতাদুটি বুজে বন্ধ হয়ে যায়। একটুক্ষণ জিভ বের করে রাখলে সেটা শক্ত হয়ে ঠোঁটের সঙ্গে জমে যায়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে-আসা বাষ্প গোঁফ-দাড়ির ওপর তুষার হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জমে গিয়ে মুখ আটকে দেয়। একটুকরো ধাতু বা ছুরির ফলা শরীরের সংস্পর্শে এলে, তখুনি সেখানে ঘা হয়ে জ্বলতে থাকে।

1957-58-এ নানাদেশের বিজ্ঞানীরা একত্র হয়ে আন্তর্জাতিক ভূপ্রাকৃতিক বর্ষে [International Geophysical Year, IGY] পৃথিবী সম্পর্কে নানা তথ্যের অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁদের কর্মতালিকার মধ্যে অ্যাণ্টার্কটিকার তথ্য সন্ধান ছিল একটা প্রধান বিষয়। এর জন্যে দক্ষিণমেরুর চারদিকে বেশ বিপদসঙ্কুল কয়েকটি স্থানে তুষার-স্টেশন বসান হয়েছিল। এমন একটি স্টেশন ছিল, Byrd স্টেশন। এই স্টেশনের জন্য ট্র্যাক্টার-টানা মালের ওয়াগন নিয়ে পাঁচ সপ্তাহ বরফের উপর দিয়ে 1035 কিলোমিটার অতিক্রম করে যেতে হয়েছিল। এই দুরূহ যাত্রায় যে কোন মুহূর্তে বরফের ফাটলে পড়ে গিয়ে ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা। ম্যাকমার্ডো প্রণালী থেকে 14000 পাউণ্ড ওজনের ট্রাক্টর সহ আটশ টন সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি প্লেনে করে একেবারে মেরুতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই অনুসন্ধানের ফলেই সেই তুষার-রাজ্য সম্পর্কে বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন সঠিক ভাবে অ্যাণ্টার্কটিকার পরিধি জানা গেছে। দেখা গেছে, সেই বরফের মহাদেশে রয়েছে বেশ কয়েকটি পাহাড় (অবশ্যই তুষারে ঢাকা), রয়েছে সুগভীর হ্রদ ও সাগর (জমাট বরফে ভরা), আছে বিশাল সব বরফাবৃত মালভূমি। কোন কোন জায়গায় বরফ জমে আছে চার হাজার মিটার পুরু হয়ে। খাস দক্ষিণমেরুতেই বরফের উচ্চতা 3000 মিটার। প্রমাণ পাওয়া গেছে সমুদ্রতল থেকে মহাদেশটির উচ্চতা গড়ে অন্ততঃ 274 মিটার। অ্যাণ্টার্কটিকাতে যে বিপুল পরিমাণ বরফ জমে আছে, তার সামান্য কিছু অংশও গলে গেলে সমস্ত মহাদেশের অধিকাংশই প্লাবিত হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে মানুষের গড়া সবকিছুই। কলকাতা, লণ্ডন, নিউইয়র্কের আর অস্তিত্ব থাকবে না। নানা দেশ থেকে বর্তমানে এখন অ্যাণ্টার্কটিকা-অভিযান শুরু হয়েছে আরও

তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। ভারত তার দ্বিতীয় অ্যান্টার্কটিকা অভিযান করেছে 1982-ডিসেম্বর মাসে। ভারতের তৃতীয় অভিযানের যাত্রীরা ১৯৮৩ সনের ২৭শে ডিসেম্বর আন্টার্কটিকাতে গিয়ে পৌঁছেছে এবং নানা পরীক্ষার কাজ শুরু করেছে।

মানুষের স্মরণকালে মেরুঅঞ্চল চিরকালই বরফাবৃত। কিন্তু এরকমটা সবসময় ছিল না। ভূতাত্ত্বিকেরা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার বছর আগে শুধু মেরুঅঞ্চল নয়, পৃথিবীর আরও অনেকটা অংশই ছিল বিরাট বরফ-স্তূপের নীচে। উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণ দিকে সমগ্র উত্তর ইউরোপ, নরওয়ে, সুইডেন, জার্মানীর অধিকাংশ, এমন কি রাশিয়ার মস্কো পর্যন্ত বরফে ঢাকা ছিল। তুষারাবৃত ছিল সম্পূর্ণ কানাডা এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশও। আজ থেকে প্রায় 13000 বছর আগে উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য সেই বরফের স্তূপ ধীরে ধীরে গলতে আরম্ভ করে। বরফের রাজ্য আস্তে আস্তে উত্তরে সরে যেতে যেতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। আরও কয়েক হাজার বছর এমনি করে চললে উত্তরমেরুর সব বরফই গলে যাবে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ উচ্চতর হবে। উত্তরমেরুতে তখন হবে জলের সমুদ্র। তারপর সেই সমুদ্র থেকে বাষ্পীভবন হবে। বাষ্পীভবনের ফলে সমুদ্রের লেভেল নেমে যাবে অন্ততঃ 90~100 মিটার। এরপর উষ্ণতা কমলেই সেই বাষ্প বরফ হয়ে জমতে শুরু করবে। বিষুবাঞ্চল থেকে উষ্ণ জলস্রোত আর উত্তরমেরু অঞ্চলে পৌঁছুবে না। হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে সমস্ত মেরুঅঞ্চলের জল জমে যাবে। তারপর তুষারপাত আর হবে না। মেরুদেশে এখন আর তুষারপাত হচ্ছে না। কেননা তুষারপাত হতে হলে সংলগ্ন জলাধার থাকা প্রয়োজন। এমনি করে বরফ জমে হাজার হাজার বছর ধরে, অর্থাৎ "তুষার-যুগ" চলে। তারপর তার গলন শুরু হয়। তুষারপাত আর তার গলন এমনি পালা-বদল করে চলে।

এখন জানা গেছে, গত দশ লক্ষ বছরে এরকম তুষার-যুগ চারবার এসেছে এবং চলে গেছে। সর্বশেষ প্রধান তুষার-যুগ আরম্ভ হয়েছিল প্রায় 130,000 বছর আগে। পৃথিবীর উষ্ণতা নেমে যাওয়াতে মেরুঅঞ্চলে তুষার পড়তে থাকে, ক্রমশঃ বরফের বিরাট স্তূপ তৈরী হতে থাকে। প্রায় 40,000 বছর ধরে এই তুষারপাত চলে এবং ক্রমে ক্রমে উত্তর গোলার্ধের স্থলভূমির এক-তৃতীয়াংশ বরফাবৃত হয়ে পড়ে ছিল। তুষারে পরিণত হওয়ার ফলে সমুদ্রের লেভেল গিয়েছিল নেমে, বিষুবাঞ্চলের উষ্ণ জলস্রোত আর মেরুদেশে পৌঁছুতে পারে নি। তখন সমস্ত মেরুঅঞ্চলই জমাট বরফে ঢেকে যায়। এই বরফস্তূপের উচ্চতা 2500~3000 মিটার এবং তার প্রচণ্ড চাপে পৃথিবীর পৃষ্ঠে নানারকম পরিবর্তন ঘটে। কোন কোন পাহাড় স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে, কোথাও চাপের ফলে স্থলভাগ বসে গিয়ে প্রকাণ্ড সব গহ্বরের সৃষ্টি হয়। উত্তর আমেরিকার বড় বড় হ্রদ—সুপিরিয়র, মিচিগান, প্রভৃতি—এমনি করেই সৃষ্ট হয়েছে। চল্লিশ হাজার বছর পর তুষার-পাত বন্ধ হল, কিন্তু তার পরেও 70000~80000 বছর তাপমাত্রার একটা মোটামুটি সমতা ছিল। সেই শীতল তাপমাত্রায় আর তুষারপাত হয় নি বটে, তবে প্রচণ্ড সব ধূলিঝড় বা তুষার-ঝড় বয়ে চলেছিল যুগ যুগ

ধরে। এরপর পৃথিবীর তাপমাত্রা একটু একটু করে বেড়ে গেল, আর বরফ গলা আরম্ভ হল। তুষার-যুগ পার হয়ে উষ্ণতর যুগ দেখা দিল। মনে হয়, এই উষ্ণতর যুগ আরম্ভ হয়েছিল 13000~14000 বছর আগে। বর্তমানে আমরা উষ্ণতর যুগের শেষ অঙ্কে রয়েছি। ক্রমশঃ উষ্ণতা বাড়ছে; একশ বছর আগেও আমেরিকার হাডসন নদীতে শীতের দিনে বরফ জমত, কিন্তু আজ আর সেখানে বরফ জমে না। গ্রীনল্যান্ড ও আইসল্যান্ডের হিমবাহের আয়তন অতি ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ ক্রমে উচ্চতর হচ্ছে এবং হয়ত 25000~30000 হাজার বছর পরে একদিন আবার সমস্ত উত্তরমেরু অঞ্চল জল-প্লাবিত হবে। এটা কল্পনা নয়, বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে এসব আমরা জেনেছি। কেন লক্ষাধিক বছর পরপর তুষার-যুগ এসে হাজির হয়—তার সঠিক ব্যাখ্যা এখনও দেওয়া যায় নি। কেউ কেউ মনে করেন, লক্ষ লক্ষ বছর পরে সূর্যের অভ্যন্তরে তেজ-উৎপাদনের একটা বৈষম্য ঘটে মহাশূন্য থেকে সূর্যের অতিরিক্ত প্রোটন বা হাইড্রোজেন অধিশোষণের ফলে (লিটলটন ও হয়েল)। এতে তাপ-বিকিরণ যায় কমে, পৃথিবীর উষ্ণতাও কিছু কমে যায়। তুষার-যুগ দেখা দেয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যখন প্রচুর ধূলিকণা আর ঘনমেঘের ও বাষ্পের আধিক্য দেখা দেয়, তখন সৌররশ্মির অনেকটাই বায়ুমণ্ডলের উপর থেকেই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়; তাপ-তরঙ্গ এসে পৃথিবীতে অনেকটা কম পৌঁছুতে পারে। তাই তাপমাত্রা কমে, তুষারপাত শুরু হয়। কোন কোন বিজ্ঞানী, যেমন, আয়ারল্যান্ডের ওপিক (E. J. O'pik), মনে করেন, সূর্যের দেহাভ্যন্তরে যে নিরন্তর হাইড্রোজেন-হিলিয়াম রূপান্তর ঘটছে, স্বাভাবিক নিয়মে তার মধ্যে অনেক যুগ পরে পরে একটু অসাম্য দেখা দেয়। এর ফলে সৌর বিকিরণের তীব্রতা একটু হ্রাস পায়, তাই পৃথিবীর তাপমাত্রা কমে যায় এবং তুষার-যুগ শুরু হয়। সূর্যের আভ্যন্তরিক সাম্য ফিরে এলেই তুষার-যুগের সমাপ্তি আরম্ভ হয়।

মেরুঅঞ্চল দুইটি বাদ দিলে প্রকৃতিতে আর বরফ দেখা যায় উঁচু পাহাড়ের মাথায়। হিমালয়, কারাকোরাম, আল্পস্, অ্যান্ডিস এসব পর্বত শিখর চির-তুষারাবৃত। উঁচু পাহাড়ের উপরের অংশের তাপমাত্রা খুবই কম। জলবাষ্পভরা বাতাস যখন এই সকল উচ্চ পর্বতশিখরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে, অত্যধিক ঠাণ্ডার জন্য তখন বাষ্প তুষারকণায় পরিণত হয়ে যায়। সেই অপরিমেয় তুষার পাহাড়ের উপর জমতে থাকে, যেন "শুভ্র উত্তরীয়প্রায় শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনারে নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে নিঃশব্দে নিভৃতে"।

এই তুষার থেকে ক্রমে বিরাট জমাট বরফের সৃষ্টি হয় আর পর্বতের উপরের দিকটা সেই বরফে ঢেকে থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যে জল অপসারিত হয় তার খানিকটা পাহাড় উদ্ধার করে ধরে রাখে। একটু ভাবলে দেখা যাবে, পৃথিবীর শতশত পর্বতে কি বিপুল জলরাশি এমনিভাবে বরফ হয়ে আটকে আছে। আর সেখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য নদনদীর। পাহাড় যে শুধু সন্নিহিত দেশের জলবায়ু, বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ করছে তাই নয়, দেশের নদনদীর সৃষ্টি করে জমির উর্বরতা ও ফলন বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। বস্তুতঃ সভ্যতা ও দেশের সামগ্রিক উন্নতির

উপর রয়েছে পর্বতের অসামান্য গৌণ প্রভাব। পাহাড় পর্বত না থাকলে বৃষ্টিপাত সমানভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ত। তাতে হয়ত শুষ্ক অঞ্চলের আদ্রতা খানিকটা বাড়ত, কিন্তু সামগ্রিক উর্বরতা যেত অনেক কমে। আজ হিমালয়ের সানুদেশে দাঁড়িয়ে যে নদনদী-অধ্যুষিত শস্যশ্যামলা গাঙ্গেয় উপত্যকার ছবি দেখতে পাই, যে শ্যাম বনানীর অপরূপ স্নিগ্ধতা ও সৌন্দর্য দেখতে পাই, হিমালয়ের অন্তর্ধানে তা আর সম্ভব হত না। গঙ্গা-সিন্ধু পরিণত হত ক্ষীণস্রোতা জলধারায়।

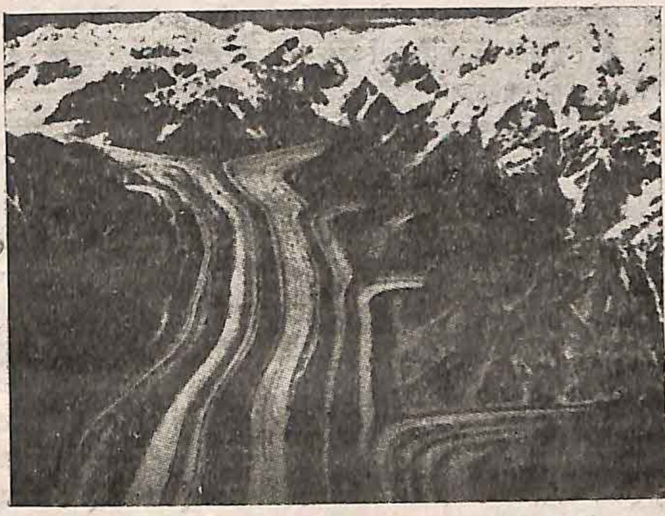
পর্বতের উপরের অংশটাতেই বরফ জমে, মাটি থেকে আরম্ভ করে উপরের দিকে সবটাই বরফাবৃত নয়। প্রত্যেকটি পাহাড়ের একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা আছে, যার, উপরের অংশে সারা বছর ধরে বরফ জমে থাকে, গ্রীষ্মকালেও সেখানে বরফ থাকবে। যে উচ্চতার উর্ধ্বে পাহাড় চিরতুষারাবৃত, তার নাম "হিমরেখা"। শীতকালে হিমরেখার নীচেও তুষারপাত হয়, বরফ জমে ; কিন্তু গরমকালে সেটা গলে যায়, নীচের দিকে আর বরফ থাকে না। কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশিখর চিরকাল তুষারে নিদ্রিত, কিন্তু নীচের দিক, যেমন দার্জিলিং, শীতের সময় বরফে ঢেকে যায়, অথচ গরমকালে সেখানে কোন বরফ নেই। এই হিমরেখার উচ্চতা নির্ভর করে প্রধানতঃ অক্ষাংশের উপরে। মেরুদেশের হিমরেখা সমুদ্রসমতলের সমান, ইউরোপের আল্পস্ শৈলমালার হিমরেখা প্রায় 2750 মিটার উপরে, আর বিষুবাঞ্চলে অ্যাণ্ডিস পর্বতের হিমরেখা 5500 মিটার উচুঁতে। ভারতের উত্তরের হিমালয়ের হিমরেখা মোটামুটি 4570 মিটার উচ্চতায়।

হিমরেখারও উঁচুতে নিরন্তর তুষার পড়ছে ; আর উপরের তুষারের চাপে নীচের তুষাররাশি জমাট বরফে পরিণত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত উপরের চাপে আর মাধ্যাকর্ষণের ফলে সেই বিরাট বরফের স্তূপ পর্বতের গা বেয়ে ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত হতে থাকে নীচের দিকে। প্রবহমান এই বরফস্তূপকে বলা হয় "হিমবাহ" বা "গ্লাসিয়ার" (Glacier)।

হিমবাহের নিম্নগতির সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু বরফ গলতে শুরু করে, আর তা থেকে ছোট ছোট পাহাড়ী জলস্রোতের উদ্ভব হয়। হিমরেখার নীচে এলে হিমবাহ যায় গলে, বিগলিত তুষার তরল জলস্রোতে পরিণত হয়—উৎপত্তি হয় নদীর। ছোট জলস্রোতগুলিও এসে আস্তে আস্তে মিশে যায় এই নদীর সঙ্গে। যমুনোত্রী এবং গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে এমনি করে সৃষ্টি হয়েছে যমুনা আর গঙ্গার। যতদূর জানা গেছে, কারাকোরামের গ্রেট বল্টোরো (Great Boltoro) পৃথিবীর দীর্ঘতম পার্বত্য হিমবাহ।

বিশাল হিমবাহ যখন নীচের দিকে নামতে থাকে তখন তার ভয়ঙ্কর চাপে পাহাড়ের গা থেকে অসংখ্য শিলাখন্ডকে সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলে। কখনও কখনও শতশত টন ভারী শিলাও এর সঙ্গে প্রচণ্ডবেগে নেমে আসে। যেখানে গিয়ে হিমবাহ গলে যায় সেখানে এসব চলমান শিলাখণ্ডগুলি সারি বেঁধে স্তূপীকৃত হয়। হিমবাহের দু'পাশের বা শেষপ্রান্তের জড় হওয়া শিলাগুচ্ছকে বলে "গ্রাবরেখা" বা "মোরেন" (moraines)। বরফের প্রচণ্ড চাপে এবং শিলাখণ্ডগুলির ঘর্ষণের ফলে

পর্বতগাত্র ক্ষয়ে মসৃণ হয়ে যায়, পাথরগুলোও ভেঙ্গে কাঁকর, বালি আর কর্দমে পরিণত হয়। হিমবাহ যেখান দিয়ে প্রবাহিত হয় তার দু'দিকটা উঁচু থাকে আর মাঝখানে খাতের সৃষ্টি হয়। সেখানকার উপত্যকা U-আকার নেয় (চিত্র ১)। নদনদীর সৃষ্টি ছাড়াও পর্বতের ক্ষয় সাধন করে জমি তৈরীতে এইসব হিমবাহের রয়েছে অসামান্য অবদান।



চিত্র ১। হিমবাহে শিলার ক্ষয়

তুষার-যুগের শেষ অঙ্কে যখন বরফ উত্তর ইউরোপ, সাইবেরিয়া এবং উত্তর আমেরিকা থেকে সরে যেতে আরম্ভ করল, তখন বহুবিস্তৃত বিশাল সব হিমবাহ ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত হয়ে গেল। অধিকাংশই নীচু সাগরের দিকে সরতে লাগল। এদের বলা হয় "মহাদেশীয় হিমবাহ"। এই হিমবাহেরই একাংশ আজকের দিনে দেখতে পাওয়া যায় গ্রীনল্যাণ্ডে আর মেরুপ্রদেশে। এই সকল হিমবাহ এসে ধীরে ধীরে সাগরে পড়ছে। এখানকার হিমরেখা সমুদ্র সমতলের সমান। এই হিমবাহই সমুদ্রে এসে ভাসমান তুষারস্তূপের সৃষ্টি করে—যার কথা আগেই বলেছি।

অনেক সময়, বিশেষতঃ মেরুঅঞ্চলে উপরের শিখরদেশ থেকে হিমবাহ নেমে এসে পর্বতের পাদদেশে ছড়িয়ে পড়ে ; এরকম প্রায়ই দেখা যায় আলাস্কা বা আইসল্যাণ্ডে, এদের নাম "পিড্মণ্ট হিমবাহ" (Piedmont glacier)। কোন কোন সময় মস্ত একটা বরফস্তূপ হিমবাহ থেকে পৃথক হয়ে হঠাৎ দ্রুত নীচে পড়ে যায় ; এটা "হিমানী সম্প্রপাত" (avalanche)। এতে প্রচণ্ড ধ্বংস সাধিত হয়। গাছপালা বাড়ীঘর সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সময় সময় হিমবাহের মধ্যে ফাটল থাকে। এগুলো আবার হালকা তুষারে থাকে ঢাকা। তাই উপর থেকে কিছু বোঝা যায় না। পর্বত-অভিযাত্রীদের এর চেয়ে সংকট আর কিছু নেই! এর মধ্যে পড়লে নিশ্চিন্ত ধ্বংস ও

মৃত্যু। প্রতিবছরেই এরকম অনেক মৃত্যুসংবাদ আসে। হেনরী আর্করাইট মঁ ব্লাঁ (Mont Blanc) পর্বত চূড়ায় উঠতে গিয়ে এমনি এক ফাটলে পড়ে মারা যান (1866)। দীর্ঘ একত্রিশ বছর পরে সেখান থেকে প্রায় আড়াই হাজার মিটার নীচে তাঁর দেহ এবং সমস্ত জিনিষপত্র, জামাকাপড় বরফের তলদেশে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল (1896)।

মানুষ সৌন্দর্যের উপাসক। উত্তুঙ্গ চিরতুষারাবৃত শৈলশিখরগুলি পৃথিবীর এক বিস্ময়কর সৌন্দর্য। সূর্যের কিরণ-সম্পাতে এদের উপর থেকে যে অপরূপ বর্ণচ্ছটার উদ্ভব হয় তার তুলনা নেই। তার অবর্ণনীয় দীপ্তি, প্রতিমুহূর্তে তার রঙের পরিবর্তন, তার কল্পনাতীত বর্ণসুষমা, তার উদার বিস্তার দেখে মানুষ অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কি হিমালয়, কি আল্পস, কি রকি পর্বতশ্রেণী—সর্বত্র হিমগিরিশৃঙ্গে রূপের এই অদ্ভুত মনোরম বিকাশ যুগ যুগ ধরে মানুষকে আকর্ষণ করেছে। মানুষ শুধু এদের কোলে শৈলনিবাস তৈরি করেই ক্ষান্ত হয়নি, এসব দুরারোহ শৃঙ্গের উপরে উঠে তাদের জয় করেছে। আমাদের গৌরব পৃথিবীর সর্বোচ্চ আর বিশালতম গিরিমালা দেবতাত্মা হিমালয়। দার্জিলিঙে দাঁড়িয়ে যখন সূর্যকরোজ্জ্বল তুষার-কিরীট কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চোখ মেলে ধরি তখন সৃষ্টির যে অপরূপ বিকাশ দেখতে পাই তা অনির্বচনীয়। সেই পরিবেশে মনের সব আবিলতা যায় ধুয়ে মুছে, স্নেহ মোহবন্ধন হয় অবলুপ্ত, প্রত্যহ-জীবনের শত অভাব-অভিযোগ তুচ্ছ হয়ে পড়ে। হিমালয় অতুলনীয়, তার "অজস্র জলধারা, অফুরন্ত অরণ্যলোক, অটুট স্বাস্থ্যশ্রী, অসংখ্য উপত্যকা—তার সঙ্গে ধবল তুষারের দৃশ্য, নীলাভনয়না গিরিনদী, বনরাজির শ্যামবসন্ত শোভা, গিরিশৃঙ্গতলে উপলখণ্ডময় নদীসঙ্গমের উদার বিস্তার আর তারই তীরে তীরে মেঘখণ্ডদলের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম আর উপরে গগনে মহামৌন শান্তি" (১) আমাদের নির্বাক নিস্তব্ধ করে দেয়। সৌন্দর্যের চর্চা এখানকার আলোচ্য নয়, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না এই দীপ্তোজ্জ্বল মহিমার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে ধরিত্রীর জলের একাংশ তুষার হয়ে পর্বতশীর্ষে স্থিতি লাভ করেছে বলেই।

তুষারের কাহিনী থেকে এখন তরল জলের কথায় আসা যাক। পৃথিবীর জলের প্রায় সবটাই রয়েছে মহাসাগর, সাগরও উপসাগরে। সামান্য কিছু রয়েছে হ্রদ, নদনদী দীঘি-সরোবর ইত্যাদিতে। প্রয়োজনীয়তার বিচারে সাগরের জলের আর নদীর জলের মধ্যে কিছুটা বৈষম্য আছে। এই হেতু এদের আলাদা করে দেখাই ভাল।

৩। সমুদ্রের কথা

পৃথিবী সসাগরা। সব কয়টি মহাদেশ আর দ্বীপ নিয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠের স্থলভূমি হচ্ছে মাত্র 29·2%। বাকী 70·8% সাগর আর মহাসাগর ; এরা মহাদেশগুলিকে ঘিরে আছে। ধরিত্রী সত্যিই সমুদ্র-মেখলা-পরা। এই বিরাট জলরাশি প্রধানতঃ সঞ্চিত হয়ে আছে তিনটি মহাসাগরে—প্রশান্ত মহাসাগর, আটলাণ্টিক

(১) দেবতাত্মা হিমালয়—প্রবোধ কুমার সান্যাল।

মহাসাগর আর ভারত মহাসাগর। মহাসাগরের কোন অংশ যখন মহাদেশের প্রান্তে বা উপকূলে এসে স্থল দিয়ে অনেকটা বেষ্টিত হয়ে পড়ে তখন তাকে আমরা বলি সাগর বা কখনও উপসাগর; যেমন, আরব সাগর, পীত সাগর, বঙ্গোপসাগর। কখনও কখনও বিস্তীর্ণ জলখণ্ড প্রায় সম্পূর্ণই চারিদিকে স্থল দিয়ে ঘেরা থাকে, মহাসাগরের সঙ্গে সামান্য সংযোগ থাকে, সেগুলোকে বলা হয় "মধ্যদেশবর্তী সাগর", যেমন ভূমধ্যসাগর, বাল্টিক সাগর, কৃষ্ণসাগর।

সমুদ্র বিশাল হলেও তার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট নয়। সুদূর নীহারিকা নক্ষত্রমণ্ডল সম্বন্ধে আমরা যতটা জানি, মেরুঅঞ্চল বা তুষারমৌলি পর্বত সম্পর্কে আমরা যা জানি, সেই তুলনায় সমুদ্রের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সীমিত। এই বিংশ শতাব্দীতেই মাত্র সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে সামুদ্রিক তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে এবং সমুদ্র-বিজ্ঞানের (Oceanography) পর্যালোচনা আরম্ভ হয়েছে। IGY-এর অনুসন্ধানের ফলে সমুদ্র বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য জানতে পেরেছি; এই সব তথ্য সংগ্রহের কাজে নানা দেশের গবেষক জাহাজ আজকাল ব্যবহার হচ্ছে, এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুয়েডিশ জাহাজ Albatross, রুশীয় জাহাজ Vityaz ও Akademik Kurchatov, আমেরিকান জাহাজ Atlantis এবং পারমাণবিক শক্তি চালিত Nautilus ইত্যাদি। এর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সেই বিখ্যাত চ্যালেঞ্জারের নামও করা যেতে পারে, যাতে করে ডারউইন "অরিজিন অফ স্পিসিস্"-এর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

তিনটি মহাসাগরের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রাধান্যই সর্বাধিক—বিস্তৃতিতে, আয়তনে, গভীরতায় সবদিক দিয়েই এটি শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর সম্পূর্ণ জলভাগের বিস্তৃতি 360,000,000 বর্গ কিলোমিটারের উপরে; এর শতকরা 43 ভাগ রয়েছে উত্তর গোলার্ধে। বিভিন্ন মহাসাগরের বিস্তৃতি, আয়তন প্রভৃতির একটা ধারণা পাওয়া যাবে নীচের সারণী থেকে।

মহাসাগর	বিস্তৃতি [বর্গ কিলোমিটার]	আয়তন [ঘন কিলোমিটার]	গড় গভীরতা [মিটার]
প্রশান্ত	$165{\cdot}2 \times 10^6$	$707{\cdot}6 \times 10^6$	4282
আটলান্টিক	$82{\cdot}4 \times 10^6$	$323{\cdot}6 \times 10^6$	3926
ভারত	$73{\cdot}4 \times 10^6$	$291{\cdot}0 \times 10^6$	3963
অন্যান্য মহাসাগর সাগর ইত্যাদি	$39{\cdot}8 \times 10^6$	$48{\cdot}2 \times 10^6$	—
মোট	$360{\cdot}8 \times 10^6$	1370×10^6	—

সমুদ্রের তল কিন্তু বেশ এবড়ো-খেবড়ো, মোটেই সমতল নয়। তলদেশে রয়েছে সুগভীর খাত, প্রশস্ত মালভূমি আর বেশ উঁচু উঁচু বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী বা শৈলশিরা। পর্বতগুলি বেশ উঁচু হলেও ওদের চূড়া জলের বেশ কয়েক শত

মিটার নীচেই রয়েছে। শুধু যে সকল জায়গায় পাহাড় বা মালভূমি অত্যধিক উঁচু, সেগুলিই জলের উপরে এসে দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। এই দ্বীপগুলি অবশ্য সব একরকম নয়। এদের কতগুলি হচ্ছে প্রবাল-দ্বীপ। প্রবাল একপ্রকার ছোট্ট সামুদ্রিক কীট, এরা দল বেঁধে থাকে সামান্য উষ্ণ জলে এবং মোটামুটি পঞ্চাশ বা ষাট মিটার জলের নীচে। এদের শরীর থেকে একটা রস বেরিয়ে এসে সমুদ্রের লবণ এবং চুনের সঙ্গে মিশে যায় এবং সেটা ওদের দেহের চারদিকে একটা কঠিন আবরণ তৈরী করে। মরে গেলে এদের দেহাবশেষ সমুদ্রতলে কোন উঁচু পাহাড়ের উপরে জমে। পরে যেগুলো আসে তাদেরও দেহাবশেষ সেখানেই সঞ্চিত হতে থাকে। এমনি করে হাজার হাজার বছর ধরে স্তরের পর স্তর জমতে জমতে জলের উপরে এসে পেঁছে যায় আর দ্বীপ তৈরী হয়—এরাই প্রবাল-দ্বীপ। অনেক সময় প্রবাল-দ্বীপ গোলাকার বলয়ের মত আকার নেয়। মাঝখানে উপহ্রদ বা লেগুন থাকে। এরকম দ্বীপের নাম প্রবাল-বলয় (atoll)। আমাদের মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ এরকম প্রবাল-বলয়। আবার আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে একটি নিমজ্জিত শৈলশিরা থেকে। ব্রহ্মদেশের টেনাসেরিম ইয়োমা পর্বত পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত রয়েছে—তার কিছু উচ্চতর শিখরই আন্দামান-নিকোবর। শ্রীলঙ্কাও সেইরকম মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত, নিমজ্জিত শৈলশিরার মাধ্যমে। এরা মহাদেশীয় দ্বীপ।

গভীর খাতগুলির বেশীর ভাগই দেখা যায় প্রশান্ত মহাসাগরে। গভীরতম খাত হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের "মারিয়ানা খাত"—গুয়াম দ্বীপের কাছে। এর গভীরতা এগার কিলোমিটারেরও বেশী। অতএব পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টকে তুলে নিয়ে যদি এই খাতে বসান হয়, তাহলে সেটি ডুবে যাবে এবং তার উপরেও দুই কিলোমিটার জল থাকবে। ভারত মহাসাগরের খাত অত গভীর নয়। কয়েকটি গভীর খাতের মাপ দেওয়া হল।

মহাসাগর	সমুদ্রখাত	গভীরতা [মিটারে]
ভারত	স্বণ্ডা খাত	7455
আটলাণ্টিক	(১) পোর্টোরিকো খাত	8750
	(২) স্যাণ্ডউইচ খাত	8264
প্রশান্ত	(১) ফিলিপাইন খাত	10497
	(২) মারিয়ানা খাত	11022

পারস্য উপসাগরের গভীরতা সব চেয়ে কম, গড়ে মাত্র 25 মিটার। তারপর নাম করা যেতে পারে বাল্টিক সাগর, আইরিশ সাগর, উত্তর সাগর। উত্তর সাগরের গভীরতা গড়ে 95 মিটার।

সৃষ্টির প্রারম্ভে সমুদ্রতল ছিল কঠিন শিলাময়। ভূগর্ভ-নিঃসৃত লাভা জমাট বেঁধে সেই শিলা তৈরী হয়েছিল। কিন্তু এখন সেই শিলার উপরে রয়েছে সূক্ষ্ম কণার এবং কর্দমের পলল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নদীনালা বেয়ে প্রচুর ধূলিকণা

সমুদ্রে অবক্ষিপ্ত হয়েছে। এই অজৈব অবক্ষেপ ছাড়াও, সামুদ্রিক কীট, প্রাণী, শামুক, উদ্ভিদের দেহাবশেষ জৈব গাদ হয়ে সমুদ্রতলে সঞ্চিত হয়েছে। এইসব মিলে বেশ পুরু কর্দমাক্ত পলিস্তর জমেছে সমুদ্রের তলায়। প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগরের তলায় এই পলির স্তর 300~400 মিটার পুরু, আটলাণ্টিকে আরও বেশী। এই কর্দমস্তরের অধিকাংশই নীলাভ, আবার কোথাও সেটা লাল বা সবুজ। এই পলির বিভিন্ন গভীরতার স্তরের নমুনা তুলে এনে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করেছেন নানা বিষয়ে। প্রমাণ পাওয়া গেছে, কোন কোন পলি সেখানে জমেছে প্রায় এক কোটি বছর আগে। গভীর সমুদ্রের তলার লাল পলিতে দেখা যায় নিকেলের পরিমাণটা বেশ অধিক, যা পৃথিবীর অন্যত্র দেখা যায় না। অনুমান হচ্ছে, প্রতিনিয়ত যে অসংখ্য উল্কাপাতের ভস্মাবশেষ সমুদ্রে পড়ে, সেটা তলদেশে গিয়ে সঞ্চিত হয়েছে, তাই নিকেলের পরিমাণ বেশী।

সমুদ্রের তাপের বাজেট

আমাদের অলক্ষ্যে সমুদ্র এক খেলায় মত্ত হয়ে আছে, সেটা হচ্ছে তার তাপ-শক্তি নিয়ে খেলা। নানাভাবে সমুদ্র তাপ সংগ্রহ করে, আবার তার তাপের খরচাও বিস্তর। সমুদ্র সাধারণতঃ তাপ পায় সৌরকিরণ থেকে। বায়ুস্তর পার হয়ে যে সূর্যরশ্মি এসে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছয় তার বেশীর ভাগ পায় সমুদ্র। এই রশ্মির কিছুটা আলোক-তরঙ্গ, অধিকাংশই তাপ-তরঙ্গ। আপাতিত রশ্মির খানিকটা অবশ্যই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়, কিন্তু একটা মোটা অংশ সমুদ্র শোষণ করে নেয়। এই জন্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের উষ্ণতা সমুদ্রের তলদেশের জলের তাপমাত্রার চেয়ে বেশী। সব অক্ষাংশে অবশ্য সূর্য্যরশ্মি সমানভাবে পড়ে না। সৌর কিরণ ছাড়াও সমুদ্র তাপ পায় বাতাসের জলীয় বাষ্প এবং মেঘস্তর থেকে। মেঘ অনেকটা তাপ আটকিয়ে রাখে, পৃথিবী থেকে পালিয়ে যেতে দেয় না। সেই মেঘ বা বাষ্প থেকে তাপ বিকিরণ হয় এবং তার অনেকটা সমুদ্র পায়। আবার যেখানে উষ্ণতর বায়ু উপর দিয়ে বয়ে যায়, সমুদ্র তার সংস্পর্শ থেকে খানিকটা তাপ শুষে নেয়।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, পৃথিবীর কেন্দ্র ত খুব উত্তপ্ত, সেখান থেকেও সমুদ্র তাপ পেতে পারে। হিসেব করে দেখা গেছে, সেখান থেকে যেটুকু তাপ আসার সম্ভাবনা সেটা একেবারেই নগণ্য। পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে পাওয়া তাপের পরিমাণ প্রতিমিনিটে প্রতি বর্গ মিটারে গড়ে এক (1) ক্যালোরি আর সেই অবস্থায় সৌরকিরণ থেকে পাওয়া তাপের পরিমাণ 3300 ক্যালোরি। এ হিসেবটা $20^\circ \sim 30^\circ$ অক্ষাংশের। সেইরকম সমুদ্রের জল সর্বদা প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু সেই জলপ্রবাহের গতীয় শক্তি থেকে উৎসারিত তাপের পরিমাণ খুবই কম, ধর্তব্যই নয়।

এত গেল পাওনার কথা। এখন তাপের ব্যয়টা দেখা যাক। সমুদ্র থেকে সব সময়েই তাপ বিকিরণ হচ্ছে। বিভিন্ন অক্ষাংশে এই বিকিরণের পরিমাণ বিভিন্ন হবেই। মেরুঅঞ্চল যতটা সৌরকিরণ পায় তার চেয়ে বেশী তাপ বিকিরণ করে।

আবার নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্র যতটা সৌরতাপ পায় তার চেয়ে কম তাপ বিকিরণ করে। তবে সব মহাসাগর একত্র করে হিসাব করলে দেখা যায় পাওনার দিকটাই বেশী। অর্থাৎ খানিকটা উদ্বৃত্ত সৌরতাপ সমুদ্রে থেকে যাচ্ছে। A যদি আহৃত তাপশক্তি হয় এবং B যদি বিকিরণের পরিমাণ হয়, তবে মোট উদ্বৃত্ত হবে $A-B$। কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠে থেকে প্রচুর জল প্রতি মুহূর্তে বাষ্পায়িত হচ্ছে। প্রতি গ্রাম জলের বাষ্পায়নে 540 ক্যালোরি তাপ প্রয়োজন হয়। সমুদ্রের আহৃত তাপের অধিকাংশ এর জন্যেই ব্যয় হয়। আবার যেখানে ঠাণ্ডাবাতাস বয়ে যায়, সমুদ্র থেকে সেটাও অনেকটা তাপ পরিবহণ করে নিয়ে যায়। কিন্তু খোদাতাল্লাহ এক পরম গাণিতিক, তার খতিয়ানে জমাখরচের নির্ভুল হিসাবে সমুদ্রের তাপশক্তির আয় এবং ব্যয় একেবারে সমান। তাই একশ বছরেও সমুদ্রের গড় উষ্ণতার কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। যদি বাষ্পীভবনে মোট তাপ ব্যয় হয় C ক্যালোরি এবং ঠাণ্ডা বাতাস সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে D ক্যালোরি শোষণ করে, তা হলে, সীমিত সময়ে $A-B=C+D$। যত্র আয় তত্র ব্যয়।

প্রতি মিনিটে প্রতি বর্গমিটারে উদ্বৃত্ত তাপ সমুদ্র পায় গড়ে 1660 ক্যালোরি, আর বাষ্পীভবনে ব্যয় হয় 1490 ক্যালোরি এবং বাতাস টেনে নেয় 170 ক্যালোরি। এটা $20^\circ \sim 30^\circ$ অক্ষাংশের হিসাব।

এক গ্রাম কোন বস্তুর তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড বাড়াতে যে তাপ দরকার হয় তাকে বিজ্ঞানীরা বলেন তার আপেক্ষিক তাপ। এই আপেক্ষিক তাপ দিয়েই বস্তুর তাপ-ধারণ শক্তি মাপা হয়। মাটি বা বাতাসের তুলনায় জলের আপেক্ষিক তাপ খুব বেশী। এর অর্থ, জল প্রচুর তাপ গ্রহণ করতে পারে, বা একই তাপ প্রয়োগে অন্য বস্তুর তুলনায় জলের তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। তাই সমুদ্র বাতাসের তুলনায় অনেক বেশী তাপ শুষে রাখতে পারে। সেই তাপ দিয়েই জল বাষ্পীভূত হতে থাকে।

সমুদ্র থেকে বাষ্প নিয়ে উত্তপ্ত বাতাস উপরের দিকে ওঠে। সেই তপ্ত জলীয় বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে শীতল মেরুঅঞ্চলের দিকে যেতে থাকে। কিন্তু মেরু-অঞ্চল সৌরকিরণ পায় কম, সেখানকার শীতল বাতাস পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের নীচু স্তর দিয়ে বিষুবাঞ্চলের দিকে আসতে থাকে। পথে দুই বিপরীতধর্মী এবং বিপরীত-গামী বায়ুস্রোতের সংঘর্ষে ছোট বড় ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়, উষ্ণতা যায় নেমে ; জলীয় বাষ্প তখন ঘনীভূত হয়ে জলবিন্দুতে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির ধারা নামে। জলে পরিণত হওয়ার সময় বাষ্প থেকে লীনতাপ ছাড়া পায়। সেই তাপ ছড়িয়ে যায় চতুর্দিকে। অর্থাৎ যে তাপটা সমুদ্রে ছিল সেটা পরিবাহিত হয়ে গেল নানা দূর দূরান্তরে। পরোক্ষে এই ভাবে সমুদ্র নানাদেশের, বিশেষতঃ উপকূলবর্তী দেশের, আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে। সেইজন্য সমুদ্রের কাছের দেশগুলিতে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম বা তীব্র শীত হয় না। সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়ে এসে স্থলভাগের উপর বৃষ্টির ধারা না দিলে বসুন্ধরার শস্যশ্যামলা হওয়া দুষ্কর হত। তাই সমুদ্রের কাছেই আমরা ঋণী।

প্রতি বছরে শুধু সাগর মহাসাগর থেকে 320000 ঘন কিলোমিটার জল বাষ্পীভূত হয়ে যায় আর হ্রদ, নদী প্রভৃতি থেকে বাষ্প হয় প্রায় 60000 ঘন কিলোমিটার। অথবা বলা যেতে পারে, সমস্ত মহাসাগরের পৃষ্ঠ হতে বছরে 100 সেণ্টিমিটার পুরু জলস্তর উড়ে চলে যায়। যে কোন সময়ে বাষ্পাবস্থায় সমস্ত বায়ুমণ্ডলে যে জল থাকে তার পরিমাণ সমুদ্রপৃষ্ঠের 2·5 সেণ্টিমিটারের সমান উচ্চতার স্তরের সমান। বাষ্পীভূত জলের অধিকাংশই বৃষ্টির আকারে ফিরে আসে সমুদ্রে। কিছু অংশ স্থলভাগে পড়ে বা পর্বতশীর্ষে জমে, সেটা প্রায় 96000 ঘন কিলোমিটার। সেটাও আবার শেষ পর্যন্ত সমুদ্রেই ফিরে আসে। এ হচ্ছে জলের প্রাকৃতিক আবর্তন-চক্র। সমুদ্রে মোট জলের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। এই জলীয় চক্রের ফলেই তাপশক্তির চারিদিকে বণ্টন ও পরিবেশন সম্ভব হয়েছে। তা না হলে পৃথিবীর অধিকাংশই মানুষের বাসযোগ্য হত না। এবং এই আবর্তন সম্ভব হয়েছে সমুদ্রের জলের তাপ-ধারণ ক্ষমতার জন্যই। পরে দেখতে পাব, সমুদ্রের নিজের অভ্যন্তরেও বড় বড় স্রোত এই তাপ পরিবহণ ও পরিবেশনে সাহায্য করছে। এই জন্যই মহাসাগরগুলিকে পৃথিবীর তাপাধার ও তাপ-পরিবাহক বলা হয়।

সমুদ্রের স্রোত

উপল উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালে তার অনন্ত বিস্তার, অপার বিশালতা, অতল গভীরতা, তার ফেনোচ্ছল ঊর্মিমালার উন্মত্ত উল্লাস আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে তটভূমিতে আছড়ে পড়ছে, আবার ফিরে যাচ্ছে। এর শেষ নেই, দিনরাত অবিরাম এই তরঙ্গাভিঘাত চলছে। "রাশি রাশি শুভ্র হাস্যে, অশ্রুজলে, স্নেহগর্বসুখে" সেই কল্লোল বেলাভূমিকে সতত আশীর্বাদে সিক্ত করে যাচ্ছে। সমুদ্রের বুকের উপর এই তরঙ্গ-প্রবাহের সৃষ্টি হয় প্রধানতঃ বহমান বায়ুর সঙ্গে জলের সংঘর্ষের ফলে। উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় বাতাসের গতিশক্তির খানিকটা জলে সঞ্চারিত হয় এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় জলের তরঙ্গের। বাতাসের বেগ যত বেশী হবে, ঢেউয়ের আকার আর গতিও তত বেড়ে যাবে। ঝড়-বাদলের সময় ঘন কালো জলদ মেঘ আর বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-তরঙ্গও প্রচণ্ড মত্ততায় পৃথিবীর বুকে এক প্রলয় নাচন শুরু করে দেয়। তখন

"হারাইয়া চারিধার নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোলে ক্রন্দনে
রোষে ত্রাসে ঊর্ধ্বশ্বাসে অট্টরোলে অট্টহাসে
উন্মাদ-গর্জনে—"

সেই তরঙ্গ ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে। সমদ্রের সেই রূপ যেমন ভয়ঙ্কর তেমনই সুন্দর। এর সুন্দরতম প্রকাশে কবিগুরুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে,

"— ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি

লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে।"

পুরীর সমুদ্রের ধারে গেলে দেখা যায়, সর্বদা অসংখ্য ঢেউ এসে বালুতটে আছড়ে পড়ছে, তার শেষ নেই। বায়ুর সঙ্গে গভীর সমুদ্র-পৃষ্ঠের ঢেউ উঁচুনীচু বঙ্কিম গতিতে উপকূলের দিকে ছুটে আসে। কূলের কাছে জলের গভীরতা যখন কমে যায়, তখন তরঙ্গের নীচের তলার গতি মন্থর হয়ে পড়ে, কিন্তু তরঙ্গের শীর্ষকে বাতাস টেনে নিয়ে চলে। ফলে ঢেউগুলো লম্ব হয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে শীর্ষদেশ ভেঙে গিয়ে জলের শুভ্র ফেনার সৃষ্টি করে। ঊর্মিভঙ্গের এই ফেনিল জল মুহূর্তে এসে বালু-বেলায় ছড়িয়ে পড়ে।

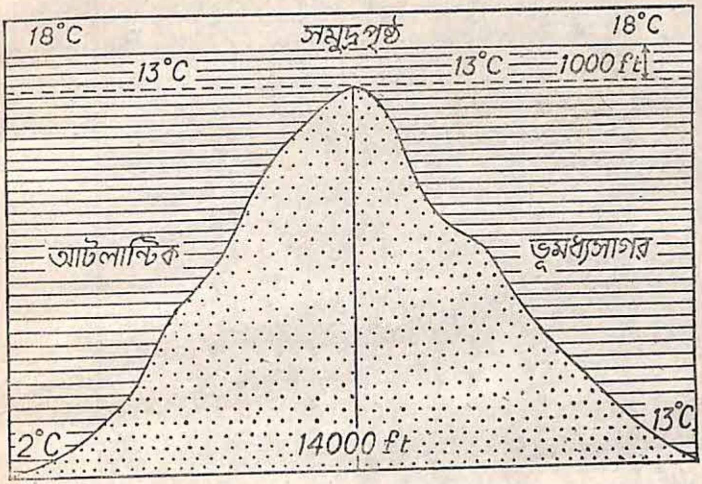
কখনও কখনও ঝড়ের সময় বাতাসের বেগ যদি খুব বেশী থাকে, তখন ঢেউয়ের উচ্চতা 18∼20 মিটারও হতে পারে। এসব ঢেউ প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করে। সেই ভীষণ তরঙ্গ ছুটে আসে তীরে উন্মত্ত আবেগে, যেন

"মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খলজল ছলভরা তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।"

মহাসাগরের অম্বুরাশির সচলতা কেবল এই তরঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়। বায়ুমণ্ডলে যেমন আয়ন-প্রত্যায়ন বায়ুপ্রবাহ আছে, মহাসমুদ্রেও বারিরাশি সেইরকম এক অংশ থেকে অন্য অংশে অহরহ প্রবাহিত হয়। সমুদ্রজলের এই গতিকে আমরা বলি স্রোত। সাগরজলের বহমানতার একাধিক কারণ রয়েছে। সাগরের বিভিন্ন গভীরতায় জলস্তরগুলি ঠিক এক রকম নয়। যত গভীরে যাওয়া যাবে, তাপমাত্রা ক্রমশঃ তত কমতে থাকে। আবার বেশী লবণতার জন্য নীচের জলের ঘনত্বও অপেক্ষাকৃত বেশী। বিভিন্ন স্তরে এই উষ্ণতা ও ঘনত্বের তারতম্য স্রোতের অন্যতম কারণ। তা ছাড়া পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যও স্রোত বইতে থাকে। প্রধান বায়ুপ্রবাহগুলি সমুদ্র-পৃষ্ঠের জলকে সঙ্গে সঙ্গে বইয়ে নিতে চায়। ফেরেলের নিয়ম মেনে উত্তর গোলার্ধের স্রোত ডানদিকে হেলে যেতে থাকে, আর দক্ষিণ গোলার্ধে তার বিপরীত। বিভিন্ন সাগরের মধ্যে যোগাযোগ আছে বটে, কিন্তু একই গভীরতায় বিভিন্ন সাগরের জলের উষ্ণতা এক নাও হতে পারে। একটি উদাহরণ দিই। ভূমধ্যসাগর আটলান্টিক মহাসাগর থেকে আলাদা হয়েছে নিমজ্জিত জিব্রাল্টার পর্বতশিরা দিয়ে। সঙ্কীর্ণ জিব্রাল্টার প্রাণালী দিয়ে এই দুই সমুদ্রের সংযোগ। এই দুটি সাগরের উপরের তাপমাত্রা সমান। কিন্তু 14000 ফিট নীচে ভূমধ্যসাগরের উষ্ণতা 13°C আর আটলান্টিকের উষ্ণতা 2°C (চিত্র ২)। আবার, ভূমধ্যসাগরের যে জল বাইরে আসে তার লবণতা 38·6‰ আর আটলান্টিক থেকে যে জল প্রবেশ করে তার লবণতা 36·4‰।

[‰ সহস্রাংশ ভাগ, অর্থাৎ 1 হাজারে এক ভাগ 1‰]

সবচেয়ে ঘন আর সব চেয়ে শীতল জল থাকে অ্যান্টার্কটিকার কাছের সমুদ্রের গভীর তলে আর উত্তরমেরুর নিকটস্থ গ্রীনল্যাণ্ডের কাছে ইরমিঞ্জার ও ল্যাবরাডোর সাগরের তলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে সমুদ্রপৃষ্ঠে সৌরকিরণ পেয়ে জল সব চেয়ে বেশী তাপিত হয়ে ফুলে ওঠে ও হালকা হয়ে যায়। এই উষ্ণ জল



চিত্র ২। ভূমধ্যসাগর এবং আটলান্টিকের জলের উষ্ণতা

তখন সেখান থেকে মেরুঅঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। সাম্য বজায় রাখতে দুই মেরুঅঞ্চলের ঘন শীতল জলও সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে বিষুবরেখার দিকে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করে। ফলে, উপরের স্তরে উষ্ণ জলস্রোত বইবে আর নীচের স্তরে বিপরীত দিকে বইবে শীতল স্রোত। প্রত্যেক মহাসাগরেই এরকমের স্রোত রয়েছে, তবে আটলান্টিকের স্রোতগুলি বিশেষ লক্ষণীয়।

অ্যান্টার্কটিকা থেকে শীতল "কুমেরু স্রোত" আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল দিয়ে উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করে। এখানে এই স্রোতের নাম "বেংগুয়েলা স্রোত"। মকরক্রান্তির কাছে এসে সেটা দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু দ্বারা পরিচালিত হয়ে বাঁদিকে যেতে থাকে, পৃথিবীর আহ্নিক গতিও তাতে সাহায্য করে। এখানে আসতে আসতে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়ে এবং দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিশে যায়। এই উষ্ণতর স্রোত তখন বেশ প্রশস্ত এবং দক্ষিণ আটলান্টিক অতিক্রম করে এসে ব্রেজিলের উপকূলে উপস্থিত হয়। ব্রেজিলের "রক অন্তরীপে' (Cape Roque) এসে এই স্রোত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি শাখা 'ব্রেজিল-স্রোত" হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল দিয়ে মেরুর দিকে ফিরে যায়, কিন্তু অপর শাখা ক্যারিবিয়ান সাগর দিয়ে গিয়ে মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে। স্পষ্টই দেখা যায়, স্থলভাগের উপস্থিতি সমুদ্রস্রোতের দিক এবং গতিবেগ উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করে। এই স্রোতই বিখ্যাত "উপসাগরীয় স্রোত" বা Gulf Stream। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং

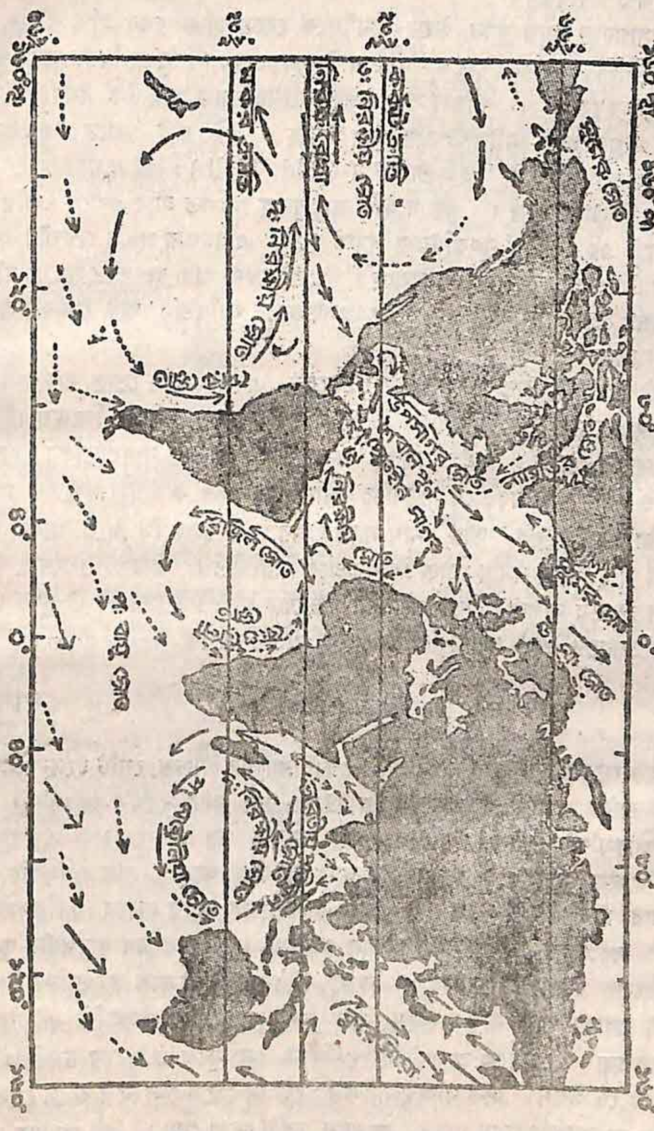
পশ্চিম ইউরোপের সমৃদ্ধির মূলে এর অবদানই সর্বাধিক। এই স্রোতের তাপমাত্রা এখানে যথেষ্ট আর এর সন্নিহিত বায়ুও উষ্ণতর এবং যথেষ্ট জলীয় বাষ্পে ভরা।



চিত্র ৩। আটলান্টিকের সমুদ্রস্রোত

এর পর উপসাগরীয় স্রোত ফ্লোরিডার নিকট দিয়ে বেরিয়ে এসে আটলান্টিক অতিক্রম করতে আরম্ভ করে। এখানে এই স্রোতের বিস্তার প্রায় 70 কিলোমিটার। কিন্তু আটলান্টিকের মাঝামাঝি গেলে এর বিস্তার হয় 1400 কিলোমিটার, গভীরতা 90 মিটার, বর্ণ ঘন নীল, উষ্ণতা 80°F। মধ্য আটলান্টিকের কাছ থেকে স্রোতটি দুই অংশে ভাগ হয়ে যায়। একটি শাখা—Gulf Stream Drift—সরাসরি গিয়ে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে এবং নরওয়ের উপকূলে পেঁছিয়—এবং শেষ পর্যন্ত উত্তরমেরু অঞ্চলে বিলীন হয়ে যায়। অপর শাখাটি ফ্রান্স, পর্তুগাল এবং পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল বেয়ে এসে নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিশে যায়। এর ফলে কর্কটক্রান্তির কাছে এক ঘূর্ণস্রোতের সৃষ্টি হয়। মাঝখানের অংশে কোন স্রোত থাকে না এবং সেখানে অজস্র সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও আবর্জনা এসে জমে। এই স্রোতবেষ্টিত স্থির জলভাগকে বলা হয় "শৈবাল-সাগর" বা Sargasso Sea (চিত্র ৩)।

উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের আনুকূল্যে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ. নরওয়ে, ফ্রান্স, পর্তুগালের উপকূলে বরফ জমতে পায় না, বন্দরগুলো সারাবছর কার্যক্ষম থাকে। কিন্তু বাল্টিক সাগরের উপকূল বছরের বেশ কয়েকমাস বরফাচ্ছন্ন থাকে। ল্যাবরাডোর এবং ব্রিটিশ



সমুদ্রস্রোত

চিত্র ৪। বিভিন্ন সমুদ্রস্রোত

দ্বীপপুঞ্জ একই অক্ষাংশে। কিন্তু ল্যাবরাডোরে বা কানাডার উপকূলে উষ্ণতর কোন স্রোত পেঁছয় না, তাই সে সব উপকূল বছরে ৭।৮ মাস বরফাবৃত। তাছাড়া, উপসাগরীয়

স্রোতের সঙ্গে যে পশ্চিমাবায়ু আসে তাতে ইংল্যান্ড এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি উষ্ণতর হয় এবং সেখানে বারিপাতও হয় যথেষ্ট। সমুদ্রের জলস্রোত কিভাবে স্থলভাগের বিশেষ অংশকে সমৃদ্ধ করে এবং তার জলবায়ুকে প্রভাবিত করে, এটি তার এক বিশিষ্ট উদাহরণ।

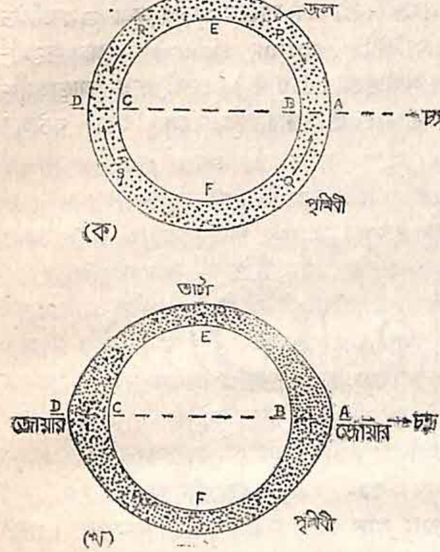
উপসাগরীয় স্রোত যখন উত্তর-পূর্বদিকে যেতে থাকে তখন অতি শীতল "সুমেরু স্রোত" গ্রীনল্যান্ডের কাছ থেকে কানাডার উপকূল বেয়ে দক্ষিণের দিকে আসে—এর নাম "ল্যাবরাডোর স্রোত"। শীতল সবুজ ল্যাবরাডোর স্রোত আর উষ্ণ ঘননীল উপসাগরীয় স্রোতের সংঘর্ষ ঘটে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের কাছে। এই দুই স্রোতের মাঝখানের অতি স্পষ্ট সীমারেখাকে বলে, "হিম-প্রাচীর" (Cold Wall)। এই দুইটি স্রোতের উপরের বাতাসের উষ্ণতাও ভিন্ন। এই দুইটি বায়ুপ্রবাহ মিলিত হলে এখানে জলীয় বাষ্প ঘন হয়ে প্রায়ই এক বিস্তীর্ণ কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করে। এখানকার সমুদ্র অগভীর এবং এখানে এক বিরাট মৎস্য-ক্ষেত্রের উদ্ভব হয়েছে। প্রায়ই দেখা যায়, অগভীর সমুদ্রে যদি বিভিন্ন তাপমাত্রার স্রোত মিলিত হয় তবে মৎস্যক্ষেত্রের আবির্ভাব ঘটে, যেমন উত্তর সাগরে, জাপান সাগরে।

আটলাণ্টিকের মত প্রশান্ত মহাসাগরেও একই ধরনের স্রোত রয়েছে। সেখানে "কুরোসিয়ো স্রোত" আটলাণ্টিকের উপসাগরীয় স্রোতের ভূমিকা নিয়েছে। সেখানেও শৈবাল সাগর রয়েছে। এই স্রোতের কল্যাণেই জাপানের বন্দরগুলির এত সমৃদ্ধি। ব্রিটেন ও জাপান বিশেষভাবে প্রকৃতির আশীর্বাদ লাভ করেছে। ভারত মহাসাগরের স্রোতধারা একটু পৃথক, তার কারণ সমস্ত উত্তর ভাগ স্থলভূমি দিয়ে আবদ্ধ। এখানে মৌসুমী বায়ু দ্বারাই সমুদ্র স্রোত বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত। ভারত, ব্রহ্মদেশ, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা উষ্ণতর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী স্রোতের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত। বিভিন্ন সমুদ্রের স্রোতের একটা ধারণা চিত্র ৪ থেকে পাওয়া যাবে।

জোয়ার-ভাটা

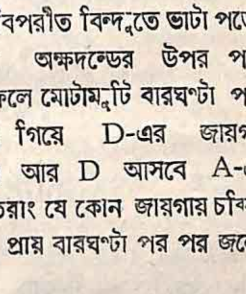
সমুদ্র-জলের সঞ্চলনের সঙ্গে আর একটি ব্যাপার জড়িত, সেটি হচ্ছে জোয়ার-ভাটা। জোয়ার-ভাটার মূলে রয়েছে পৃথিবীর উপর চন্দ্র আর সূর্যের আকর্ষণ। এর মধ্যে চাঁদের আকর্ষণই প্রধান। চাঁদের চেয়ে সূর্যের ভর তিনশত লক্ষ গুণ বেশী, কিন্তু পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব চাঁদের দূরত্বের 390 গুণ। চাঁদ পৃথিবীর খুব কাছে বলে তার টানটাই প্রবলতর। এ যেন রাষ্ট্রপতির চেয়ে গ্রামের চৌকিদারের প্রতাপ বেশী। বহুদূরে বলে সূর্যের টান ক্ষীণতর। এদের টান পৃথিবীর স্থলের উপর যেমন জলের উপরেও তেমনই। কিন্তু কঠিন ও ভারী বলে স্থলভূমির উপরে টানের প্রভাবটা বোঝা যায় না। তরল বলে সমুদ্রের উন্মুক্ত জলরাশি এই টানে সহজেই সঞ্চালিত হয়। যেদিকে আকৃষ্ট হয় সেদিকে জল ফুলে ওঠে আর চারদিক থেকে জল সেখানে ছুটে আসে—একে বলি জোয়ার। যেখান থেকে জল চলে আসে সেখানে জলের পৃষ্ঠতল বা লেভেল নেমে যায়। সেখানে ভাটা দেখা দেয়। এই জোয়ার অথবা ভাটা পৃথিবীর দুই বিপরীত পৃষ্ঠে এক সময়েই দেখা দেয়—চিত্র থেকে সেটা বোঝা সহজ

হবে (চিত্র ৫)। ধরা যাক, চাঁদ পৃথিবীকে আকর্ষণ করছে। A বিন্দুটি চাঁদের কাছে বলে চাঁদের টান সেখানে B স্থলবিন্দু থেকে বেশী জোরালো। A বিন্দুতে আছে জল, সেই জল এগিয়ে যায়, ফলে আশ-পাশের P, Q থেকে জল সেখানে ছুটে আসে—A-তে জোয়ার দেখা দিল। A-এর সরাসরি বিপরীতে পৃষ্ঠে রয়েছে C আর D। স্থলবিন্দু C-তে চাঁদের টান D-জলপৃষ্ঠ থেকে বেশী। সুতরাং C যতটা চাঁদের দিকে সরছে D ততটা নয়। ফলে আশপাশের অঞ্চল থেকে জল এসে জমছে, অর্থাৎ D-তেও জোয়ার হবে। তাই পৃথিবীর দুই বিপরীত বিন্দুতে এক সঙ্গে জোয়ার দেখা দেয়। E এবং F থেকে জল চলে যায়, তাই এই দুই বিপরীত বিন্দুতে ভাটা পড়ে। পৃথিবীর অক্ষদন্ডের উপর পাক খাওয়ার ফলে মোটামুটি বারঘণ্টা পরে A-বিন্দু গিয়ে D-এর জায়গায় পেঁছুবে আর D আসবে A-এর জায়গায়। তখন আবার জোয়ার হবে চাঁদের টানে। সুতরাং যে কোন জায়গায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুবার জোয়ার এবং দুবার ভাটা দেখা যায় ; প্রায় বারঘণ্টা পর পর জলের লেভেল বেড়ে যায়।



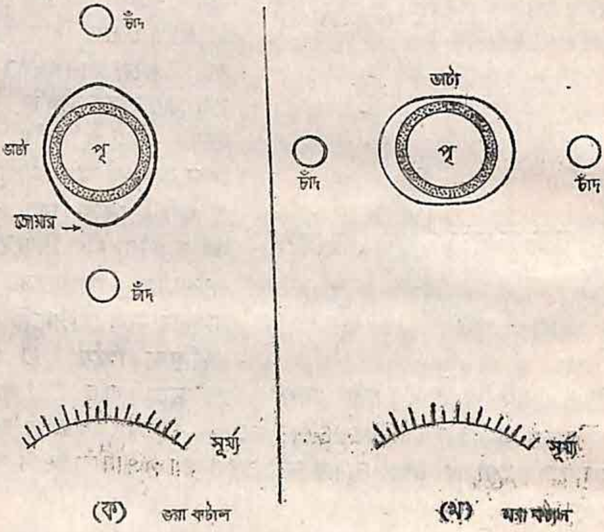
চিত্র ৫। পৃথিবীর বিপরীত পৃষ্ঠের জোয়ার

বস্তুতঃ দুই জোয়ারের মধ্যে সময়ের ব্যবধানটা বারঘণ্টার চেয়ে একটু বেশী। মনে কর, A বিন্দুতে জোয়ার এল, সে যখন চাঁদের সামনে M_1-এ হাজির হল (চিত্র ৬)। ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে A-বিন্দু যখন M_1-এ এসে উপস্থিত হল তখন চাঁদ M_1-থেকে M_2 বরাবর সরে গেছে। সুতরাং A-কে চাঁদের সামনে যেতে হলে M_2-তে গিয়ে হাজির হতে হবে, তবেই জোয়ার হবে। চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে আটাশ দিনে. সুতরাং একদিনে চাঁদ সরে যায় কক্ষপথের 1/28 অংশ। পৃথিবীর এই অংশটুকু পাক খেতে লাগবে $(24 \times 60)/28$ মিনিট = 52 মিনিট। অর্থাৎ প্রতি 24 ঘণ্টা 52 মিনিট পরে পৃথিবীর একটি স্থান চাঁদের মুখোমুখি হয়—এর মধ্যে দুবার জোয়ার হয়। অতএব 12 ঘণ্টা 26 মিনিট পর পর জোয়ার দেখা দেবে। এই হিসেবেই গঙ্গার জোয়ারের সময় প্রতিদিনের কাগজে বের হয়।



চিত্র ৬। দুই জোয়ারের সময়ের ব্যবধান

জোয়ারের জন্যে জলের স্ফীতি কিন্তু রোজ সমান হয় না। পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় জোয়ারের জল খুব বেড়ে যায়, কিন্তু সপ্তমী-অষ্টমী তিথিতে যে জোয়ার আসে তার জলের স্ফীতি অনেকটা কম। পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী মোটামুটি একই রেখায় থাকে, দুইয়েরই সমস্ত টানটা এক লাইনে পড়ার জন্য জলস্ফীতি হয় বেশী। একে বলা হয়, "ভরা কাটাল" (spring tides)। আর সপ্তমী-অষ্টমীতে সূর্য পৃথিবী ও চন্দ্র সমকোণে অবস্থিত (চিত্র ৭)। তাই দুই আড়াআড়ি টানের ফলে জলের স্ফীতি তত হয় না। এই জোয়ারকে বলে "মরা কটাল" (neap tides)।



চিত্র ৭। ভরা কটাল ও মরা কটাল

আগের পরিচ্ছেদে যে ঢেউয়ের কথা বলা হয়েছে, সেটা বায়ুপ্রবাহের জন্যে কেবলমাত্র সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের মধ্যেই সীমিত। কিন্তু জোয়ারের সময় চাঁদের টান পড়ে সম্পূর্ণ বারিরাশির উপরে। জোয়ারের জল সঞ্চলনের ফলে যে ঢেউয়ের উদ্ভব হয়, সেটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। স্থলের উপকূলের সমুদ্র যদি অগভীর এবং প্রশস্ত হয় তবে জোয়ারের জলস্ফীতি বিশেষ লক্ষ্য হয় না, যেমন উত্তর সাগরের উপকূলে বা প্রশান্ত মহাসাগরের তাহিতি দ্বীপের কাছে। কিন্তু যেখানে জল দুইটি স্থলভাগের মধ্যের সরু পথে প্রবাহিত, সেখানে জোয়ার তীব্র হয়; যেমন ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে, বা কানাডার উত্তরে ফাণ্ডি উপসাগরে।

জোয়ারের জলের লেভেল যখন বাড়ে তখন নদীর মোহনা দিয়ে সেই জল নদীর ভিতরে প্রবেশ করে। সংকীর্ণ এবং অগভীর নদীতে এসে স্বভাবতঃই জোয়ার বাধা পায় আর জল স্ফীত হয়ে উঁচু হয়ে ওঠে। মোহনায় কোন চর বা দ্বীপ থাকলেও জোয়ারের ঢেউ খুব উঁচু হয়। আমাদের দেশে এরকম বিরাট তরঙ্গের জোয়ারকে বলে

"বান"। হুগলী নদীতে যখন বান ডাকে তখন জল কখনও কখনও 5-6 মিটার উঁচু হয়ে আসে। ইয়াং-সিকিয়াং, আমাজোন, সীন প্রভৃতি নদীতেও এরকম বান দেখা যায়। চীনের সিনটিয়াং নদীতে 15 কিলোমিটার বেগে যে বান প্রবেশ করে অনেক সময় তার উচ্চতা 8 মিটারও হয়।

জোয়ার-ভাটার উপরে আমাদের অনেক সময় নির্ভর করতে হয়। জোয়ারের সময় বড় বড় জাহাজ নদীতে প্রবেশ করে বন্দরে পৌঁছুতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যের তাতে সুবিধা হয়। বেলোর্মি-অধ্যুষিত নদীগুলো তাই খুব নাব্য থাকে। কলকাতাতেই বড় জাহাজগুলো জোয়ারের সময়ে আসে এবং বেরিয়ে যায়। ভাটার টানে নদীর আবর্জনার অধিকাংশ সাগরে চলে যায়। সুতরাং নদীর খাত গভীর থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে জোয়ারের জন্য বন্দর তুষারমুক্ত থাকতে পারে।

সুমেরু অঞ্চলে শ্বেত সাগরের তীরে কোথাও কোথাও উঁচু উঁচু কাঠের খুঁটির উপরে জাল বেঁধে রাখা হয়। জোয়ারের সময় সেই খুঁটিগুলো জলে ডুবে যায়। তারপর ভাটার টানে জল যখন নেমে যায়, তখন দেখা যায় খুঁটির উপরের জালে মস্ত বড় বড় স্যামন মাছ আটকে আছে। মাছ ধরার এ এক বিচিত্র পদ্ধতি।

বর্তমান শতাব্দীতে কল-কারখানা আর পরিবহণের সম্প্রসারণ বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে, তাই প্রচুর পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কয়লা আর পেট্রোলের ভাণ্ডার ক্ষীণতর হচ্ছে। এজন্য মানুষ সন্ধান করছে প্রকৃতির অন্যান্য শক্তি-উৎস। পারমাণবিক বিভাজন থেকে শক্তি সংগ্রহ করার এত তোড়জোড় এই কারণেই। জোয়ারের প্রবল জলোচ্ছ্বাস যখন প্রচণ্ড বেগে নদীতে প্রবেশ করে তখন তার মধ্যে প্রচুর গতীয় শক্তি থাকে, এই শক্তিকে কাজে লাগানোর কল্পনা বহুদিনের। অধুনা ফ্রান্সে রান্স (Rance) নদীর মোহনায় অপেক্ষাকৃত নীচু বাঁধ তৈরী করে তার নীচে বিশেষ ধরনের টারবাইন বসান হয়েছে। জোয়ার ও ভাটার জলের প্রবল স্রোতে ঐ টারবাইন ঘুরতে থাকে এবং তা থেকে তড়িৎ উপাদন হচ্ছে। উৎপাদনের পরিমাণ কম নয়, 240,000 কিলোওয়াট। নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য নদীর মোহনায় এরকম ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

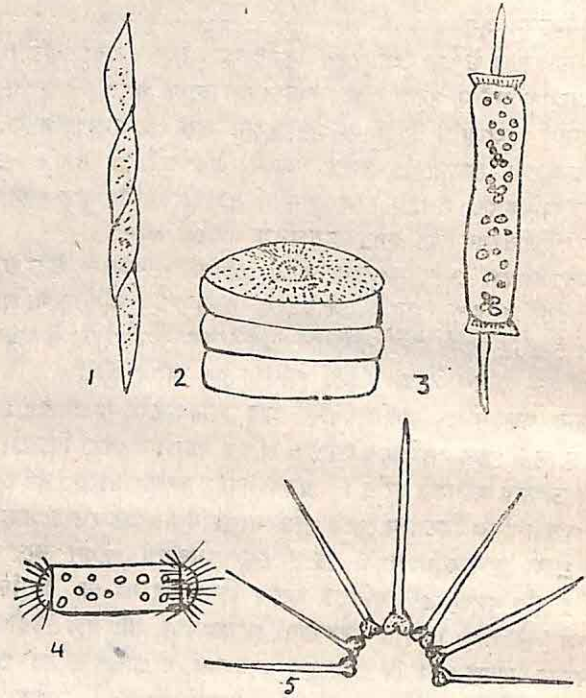
৪। সমুদ্রের সম্পদ

সমুদ্র এক অশেষ এবং অমূল্য সম্পদের ভাণ্ডার। এই সম্পদ প্রধানতঃ দুই রকমের—জৈব সম্পদ এবং খনিজ সম্পদ।

সমুদ্রের অভ্যন্তরে জীবজগতের বিস্তার অসীম। ক্ষুদ্রতম এককোষী জীব থেকে পৃথিবীর বিশালতম প্রাণী তিমি—সবই সমুদ্রে রয়েছে। বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের জৈব জগৎকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করে দেখেন ঃ (১) প্লাংকটন (২) নেকটন এবং (৩) বেনথোস্।

প্লাংকটন। জৈব সম্পদের বেশীর ভাগই হচ্ছে প্লাংকটন। প্লাংকটন জলে ভাসমান অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণশীল বস্তু। এরা জলের স্রোতে ভেসে থাকে, সাঁতার কাটতে পারে না। এদের বহু প্রজাতি। এদের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র মৎস্যাণু, মাছের শূক,

অনেক এককোষী প্লাংকটন যেমন, diatoms, dianoflagellates, cocolithophores প্রভৃতি আছে (চিত্র ৮)। এরকম ছোট্ট প্লাংকটনের দেহের প্রোটোপ্লাজম



চিত্র ৮। কয়েকটি প্লাংকটনের ছবি : ডাইঅ্যাটম এবং ডাইনোফ্লাজিলেট

একটা চুনজাতীয় বা বালুকাজাতীয় সচ্ছিদ্র আবরণে ঘেরা। এরা এত ছোট, যে অধিকাংশকেই শুধু অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়।

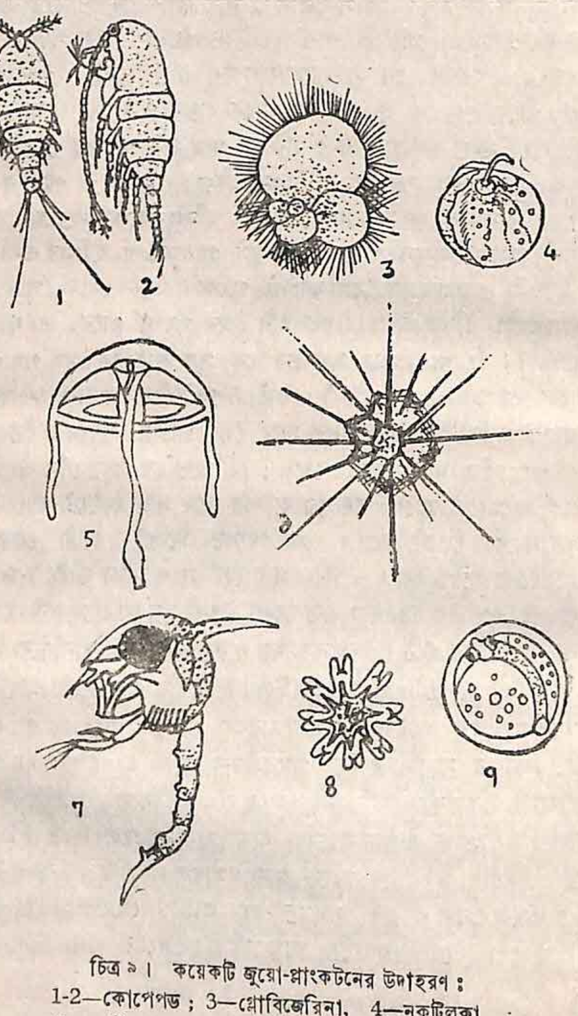
বেশীর ভাগ প্লাংকটনই উদ্ভিদ-জাতীয়, এদের বলা হয় ফাইটো-প্লাংকটন (phytoplankton)। অপরগুলি প্রাণিজ-প্লাংকটন বা জুয়ো-প্লাংকটন (zooplankton)। বছরে সমুদ্রে মোট ষাট হাজার কোটি টন (600,000,000,000 টন) জৈব সম্পদের সৃষ্টি হয় এবং এর মধ্যে পঞ্চাশ হাজার কোটি টনেরও বেশী ফাইটো-প্লাংকটন, অর্থাৎ শতকরা 92 ভাগ হচ্ছে উদ্ভিজ্জ-প্লাংকটন। স্থলভূমির উৎপাদনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সারা বছরে ভূভাগে যে উদ্ভিদ, তৃণলতা ইত্যাদি জন্মায় তার মোট পরিমাণ ত্রিশ হাজার কোটি টন ; এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ বন-জঙ্গল, আর বিশ হাজার কোটি টন আবাদী ফসল।

সম্পূর্ণ ফাইটো-প্লাংকটনটাই তৈরী হয় সমুদ্রের উপরের জলস্তরে। এর জন্যে সূর্যের আলো এবং একটু বেশী তাপমাত্রা প্রয়োজন। উন্মুক্ত স্বচ্ছ সমুদ্রে আলো প্রায়

100 মিটার পর্যন্ত প্রবেশ করে আর নীচের তুলনায় উপরের স্তরের তাপমাত্রাও বেশী। তাই ফাইটো-প্লাংকটন 100-150 মিটার গভীরতার মধ্যেই জন্মায়। সমুদ্রের নীচের তলায় ফাইটো-প্লাংকটন থাকে না। ফাইটো-প্লাংকটনের কোষের প্রোটোপ্লাজমের সঙ্গে সবুজ ক্লোরোফিল কণাও থাকে। এই সবুজ কণা সূর্যালোক শোষণ করে এবং তার সাহায্যে দিনের আলোতে ফাইটো-প্লাংকটন কার্বন-ডাইঅক্সাইডকে জৈব পদার্থে পরিণত করে। অর্থাৎ গাছের পাতায় যে সালোকসংশ্লেষণ হয়, সেই পদ্ধতিতেই ফাইটো-প্লাংকটনেও খাদ্য প্রস্তুত হয়। কার্বন-ডাইঅক্সাইড জলেই দ্রবিত অবস্থায় থাকে, তাই যথেষ্ট। যে সমস্ত জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ মরে যায়, তাদের দেহাবশেষ ব্যাক্টিরিয়ার দ্বারা নানারকম সরলতর পদার্থে পরিণত হয়। ধ্বংস ও পচনের ফলে সমুদ্রতলে এইভাবে প্রচুর অবশেষ পড়ে আর সেখানে খনিজবস্তুও রয়েছে। সমুদ্রস্রোত এর কিয়দংশ নিয়ে আসে উপরের তলায়। ফাইটো-প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্য যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদি প্রয়োজন সেগুলো ফাইটো-প্লাংকটন ওখান থেকে পেয়ে যায়। তাছাড়াও পচনের ফলে জলে দ্রবিত অবস্থায় অনেকটা জৈব পদার্থ থাকে, তা ফাইটো-প্লাংকটনের বিশেষ প্রয়োজন। দেখা গেছে সমুদ্রের যে সব জায়গায় জৈব পদার্থ প্রচুর সেখানে ফাইটো-প্লাংকটনের ফসলও খুব বেশী। ফাইটো-প্লাংকটনে খাদ্য-সংশ্লেষণে শুধু শর্করা জাতীয় পদার্থই সৃষ্টি হয় না; এর সঙ্গে তৈলজাতীয় পদার্থও তৈরী হয়। তিমি প্রচুর ফাইটো-প্লাংকটন নিয়ত খেয়ে ফেলে; তিমিতে যে প্রচুর চর্বি ও তেল আছে সেটা ফাইটো-প্লাংকটন থেকেই আসে। দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফাইটো-প্লাংকটন-কোষ বিভক্ত হয় এবং নতুন কোষ তৈরী করে। এক দিনের মধ্যেই একটা কোষ থেকে অসংখ্য ফাইটো-প্লাংকটনের সৃষ্টি হয়। প্রতি মুহূর্তে সংখ্যাতীত ফাইটো-প্লাংকটনের উদ্ভব হচ্ছে। কখনও এক এক জায়গায় এত বেশী তৈরী হয় যে জলের উপরের স্তরটা একটা ভারী সূপের মতো হয়ে ওঠে। অনেকসময় দূর থেকে সেই স্থানটিকে সবুজ বা হলদে দেখায়। অনেকটা ফাইটো-প্লাংকটনই উচ্চতর প্রাণীর খাদ্যরূপে অন্তর্হিত হয়, আবার এক অংশ মরে যায় এবং পচনের ফলে নানারকম পদার্থে পরিণত হয়। জীবজগতের ধ্বংস থেকেই আবার নতুন ফাইটো-প্লাংকটনের বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন হয়। এইভাবে সমুদ্রের জীবনের এক চক্রীয় পরিক্রমা চলছে। এ বিষয়ে সমুদ্রস্রোতের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। স্রোত উপাদানগুলি বয়ে নিয়ে না এলে ফাইটো-প্লাংকটনের সৃষ্টি দুষ্কর হত। আমাদের জমি চাষ করতে আমরা লাঙল বা ট্রাক্টার ব্যবহার করি, জমিতে সার মিশিয়ে তাকে উর্বর করি। সমুদ্রে এই কাজটি স্রোতের সাহায্যেই হয়ে থাকে। স্রোতই নানা উপাদান বয়ে নিয়ে এসে প্লাংকটন উৎপাদনের জন্য উপরের স্তরকে উর্বর করে দেয়।

প্রাণিজ-প্ল্যাংকটন বা জুয়ো-প্ল্যাংকটন বছরে জন্মায় প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টন। উদ্ভিজ্জ প্লাংকটনের তুলনায় অবশ্যই অনেক কম, কিন্তু সমস্ত স্থলজ প্রাণী উৎপাদনের চেয়ে বহুগুণ অধিক। প্রাণিজ-প্লাংকটনে রয়েছে প্রচুর প্রোটিন, স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং ভাইটামিন। অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন খাদ্যের জন্য আমরা এই উৎসের দিকে হাত বাড়াতে বাধ্য হব।

জ্বয়ো-প্লাংকটনে এককোষী অনেক প্রজাতি ত আছেই, তা ছাড়া আছে খ্বব ক্ষ্বদ্র ক্ষ্বদ্র নানাধরনের চিংড়ি জাতীয় মাছ বা কোপেপড, নানারকম বড় মাছের ডিম আর প্রথম অবস্থার চারা, বিভিন্ন জলজ প্রাণীর শ্বক, ছোট্ট ছোট্ট জেলী মাছ ইত্যাদি (চিত্র ৯)।



চিত্র ৯। কয়েকটি জুয়ো-প্লাংকটনের উদাহরণ :
1-2—কোপেপড ; 3—গ্লোবিজেরিনা, 4—নক্‌টিলুকা
5—জেলিমাছ, 6—রেডিয়োলারিয়ান, 7-9—বিভিন্ন লার্ভা

এককোষী জ্বয়ো-প্লাংকটনগ্বলি বস্তুতঃ প্রোটোজোয়া বা আদিপ্রাণী, প্রাণিজগতের ক্ষ্বদ্রতম প্রতিনিধি। এদের কোন কোন প্রজাতি নগ্ন বা আবরণহীন, আবার অনেকের একটি বাইরের সচ্ছিদ্র আবরণ বা খোলস আছে। এদের হাত-পা, ম্বখ, চোখ, মস্তিষ্ক

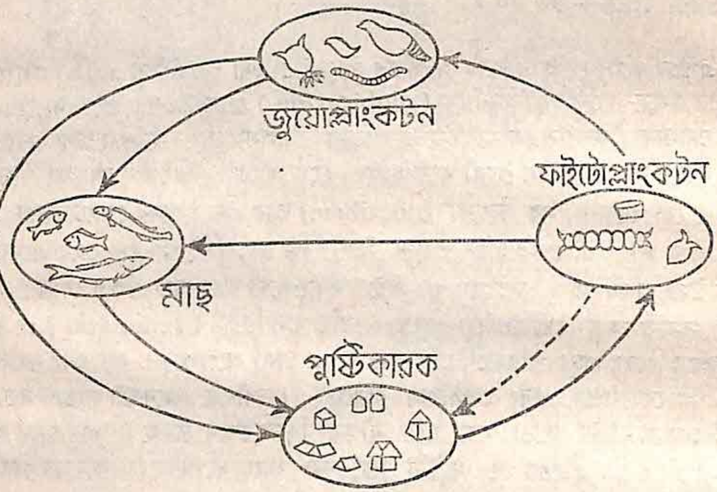
কিছু নেই, কিন্তু প্রাণীর বৈশিষ্ট্য অনেক আছে। সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়ে এরা দেহের অংশকে সরু সূতার মতো বের করে খাদ্য সংগ্রহ করে। এগুলোর দ্রুত বিভাজন ঘটে এবং অতি অল্প সময়ে একটি প্রোটোজোয়া থেকে একই রকমের বহু প্রোটোজোয়ার সৃষ্টি হয়। কোন কোন প্রোটোজোয়াতে নীচের অংশ সরু হয়ে লেজের আকার নেয় এবং সেটাকে পরিচালিত করে প্রোটোজোয়া স্থানান্তরে যেতে পারে। দেহের উপরের সচ্ছিদ্র আবরণের সাহায্যে এদের শ্বাস-প্রক্রিয়া চলে। মরে গেলে এদের দেহাবশেষ সমুদ্রতলে গিয়ে সঞ্চিত হয়।

এখানে কয়েকটি প্লাংকটনের আকৃতির নমুনা দেওয়া হল (চিত্র ৯)। অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর সমুদ্র-পৃষ্ঠে গ্লোবিজেরিনা (globigerina) প্রোটোজোয়া প্রচুর থাকে। এরা ছোট গোলাকার ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পাতলা খোলসযুক্ত। বৃদ্ধির জন্য এরা অনেক সময় নতুন নতুন খোলস তৈরী করে সংহত হয়ে থাকে। এই সব খোলের গায়ে সরু সরু শুঁয়ো থাকে। নক্‌টিলুকা (noctiluca) আর এক রকমের প্রোটোজোয়া, এদের দেহ থেকে মৃদু নীলাভ-সবুজ আলো বিচ্ছুরিত হয়, সেইজন্য অন্ধকারে এদের দূর থেকে উজ্জ্বল দেখায়। মাইলের পর মাইল সমুদ্রপৃষ্ঠ রাত্রে আলোকিত দেখায়। আর একটি সুন্দর স্বচ্ছ প্রোটোজোয়া হচ্ছে রেডিয়োলারিয়া (radiolaria); ভারত মহাসাগরে এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত বড় এবং বহুকোষী প্রাণী, যথা কোপেপড এবং জেলীমাছ রয়েছে। জেলীমাছ অনেকটা ছাতার মত, এর মুখটি ছাতার বাঁটের মতো সরু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। এর চোখ আছে, খাদ্য সংগ্রহের জন্য হাতের মত দুইটি সরু নল আছে দুপাশে। ক্ষুদ্রতর প্লাংকটন খেয়ে এগুলো বৃদ্ধি পায়। নানা ধরণের জেলীমাছ দেখা যায়। কোপেপডগুলো চিংড়ির মতো দেখতে, চার-পাঁচ মিলিমিটার মাত্র ও দেহের উপর শক্ত খোল থাকে। বিভিন্ন খণ্ড যুক্ত হয়ে এদের দেহ তৈরী, পাগুলোও তাই। সমুদ্রে প্রচুর কোপেপড রয়েছে ; এরা বিভিন্ন প্লাংকটন উদরসাৎ করে বড় হয়। আবার এগুলো মাছের অতি প্রিয় খাদ্য।

ফাইটো-প্লাংকটনই হচ্ছে প্রাণিজ-প্লাংকটনের প্রধান খাদ্য। অধিকাংশ ফাইটো-প্লাংকটনই জুয়ো-প্লাংকটনের পেটে যায়। কোন কোন মাছ এবং বিশেষ করে তিমি ফাইটো-প্লাংকটন খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। ফাইটো-প্লাংকটনের সাহায্যে যে জুয়ো-প্লাংকটন হয় সেগুলো আবার ছোট ছোট চিংড়ি জাতীয় মাছ, যথা কোপেপডের শিকার। আবার এই কোপেপড বা ছোট মাছগুলি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বড় মাছের আহার। এদের সাহায্যেই মাছের পুষ্টি। কোপেপড খেয়ে সার্ডিন মাছ পুষ্ট হয় আবার সার্ডিন মাছ খেয়ে মেকেরেল মাছ বেড়ে ওঠে। এমনি করে ক্ষুদ্রতম প্লাংকটন থেকে বৃহত্তম তিমি পর্যন্ত একে অপরকে সংহার করে এবং আত্মসাৎ করে বাঁচার লড়াই করছে। বস্তুতঃ সমুদ্রের বিশাল জৈব সম্পদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে ফাইটো-প্লাংকটনের উপরে। কোটি কোটি টন ফাইটো-প্লাংকটন নিরন্তর তৈরী না হলে সমুদ্রের প্রাণসম্পদ লয় পেয়ে যেত

(চিত্র ১০)। সমুদ্রের জৈব জগতে খাদ্যের সংস্থান এবং দেহের পুষ্টিসাধন এই ভাবেই চলে।

নেকটন। এরা হচ্ছে সমুদ্রের সতত সন্তরণশীল প্রাণী। ছোট ছোট মাছ থেকে হাঙর, তিমি পর্যন্ত সবই নেকটন। সমুদ্রের সব স্তরেই এদের দেখা যায়, তবে যেগুলো বেশী দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে সেগুলো প্রায়ই জলের উপরের স্তরে থাকে।

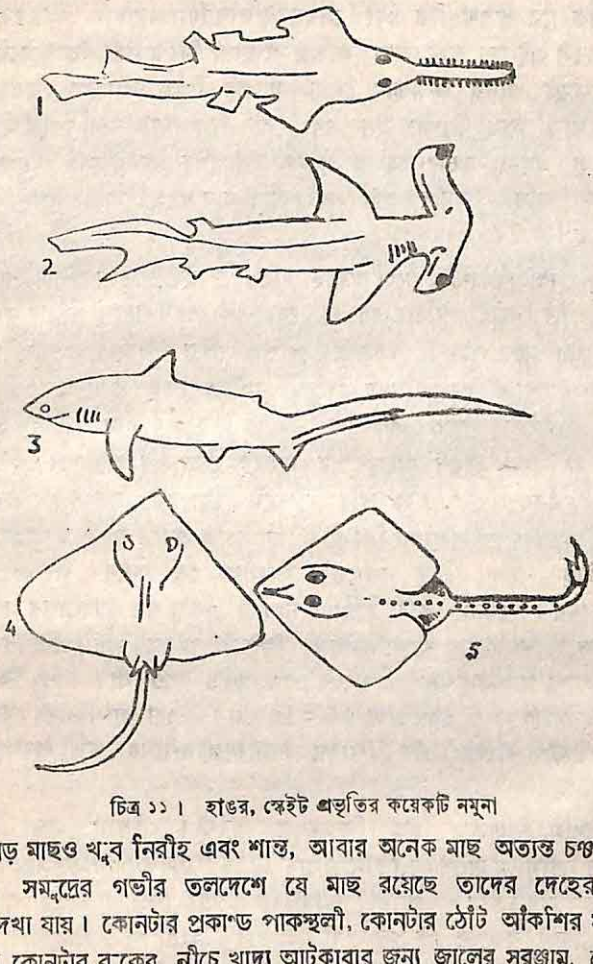


চিত্র ১০। সামুদ্রিক জৈবজগতের পরিক্রমা

সমুদ্র-সম্পদের কথা উঠলে প্রথমেই আমাদের মনে আসে মাছের কথা। যদিও এ পর্যন্ত 40000-এরও বেশী বিভিন্ন জাতের মাছের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে, তবুও সমুদ্রের সমগ্র জৈব সম্পদের তুলনায় মাছের পরিমাণ বেশী নয়। ছয়-সাত লাখ মাছ-ধরা জাহাজের সাহায্যে বছরে যে মোট প্রাণিজ খাদ্য সংগ্রহ করা হয় তার মোট পরিমাণ তিন-চার কোটি টনের অধিক নয়। এর প্রায় নব্বই শতাংশই মাছ আর বাকীটা কাঁকড়া, হাঙর, শামুক, চিংড়ি ইত্যাদি। সমুদ্রের অসীম ভাণ্ডারের তুলনায় এই পরিমাণটা কিছুই নয়। এই মাছের অনেকটা অবশ্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আরও নানা প্রয়োজনে মৎস্যজাত দ্রব্য কাজে লাগান হয়। বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে কড, হ্যালিবাট জাতীয় মাছ ; এদের তেল মূল্যবান ঔষধ হিসাবে গণ্য। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছ নির্ভর করে প্লাংকটনের উপরে। এই কারণেই অধিকাংশ মাছ দেখা যায় 100~150 মিটার গভীরতার মধ্যে। বিশেষ করে একাধিক স্রোত এসে যেখানে মেশে সেখানে প্লাংকটন প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং সেই সব জায়গাতেই মাছের প্রাচুর্য দেখা যায়।

অধিকাংশ মাছেরই কঠিন শিরদাঁড়া থাকে এবং শরীরের কাঠামোটা হয় শক্ত হাড়ের তৈরী। এদের ডানা বা পাখনা থাকে, যা সন্তরণের সহায়ক। ফুলকোর সাহায্যে এরা

জলের দ্রবিত বায়ু গ্রহণ করে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়। সব চেয়ে ছোট মাছ—"ফিলিপিন গোবি"—ফিলিপিন দ্বীপের কাছের সমুদ্রে দেখা যায় ; এরা মোটে 5~6 মিলিমিটার লম্বা। অনেক মাছের গায়ে প্রজাপতির মতো নানা রঙের সুন্দর বৈচিত্র্য দেখা যায়। অনেক মাছেরই দেহচ্ছটা রূপোর মতো উজ্জ্বল। কোন কোন



চিত্র ১১। হাঙর, স্কেইট প্রভৃতির কয়েকটি নমুনা

বেশ বড় বড় মাছও খুব নিরীহ এবং শান্ত, আবার অনেক মাছ অত্যন্ত চঞ্চল এবং হিংস্র প্রকৃতির। সমুদ্রের গভীর তলদেশে যে মাছ রয়েছে তাদের দেহের অনেক রকম বিবর্তন দেখা যায়। কোনটার প্রকাণ্ড পাকস্থলী, কোনটার ঠোঁট আঁকশির মত তিন-চার ফিট লম্বা, কোনটার বুকের নীচে খাদ্য আটকাবার জন্য জালের সরঞ্জাম, কোনটার গায়ে তীক্ষ্ম কাঁটা ইত্যাদি। গভীর তলের অনেক মাছের থেকে আবার আলো-বিচ্ছুরণও হয়। খাদ্যসংগ্রহ, সঞ্চয়, আত্মরক্ষার তাগিদ—এই সব কারণেই এসকল ব্যবস্থা।

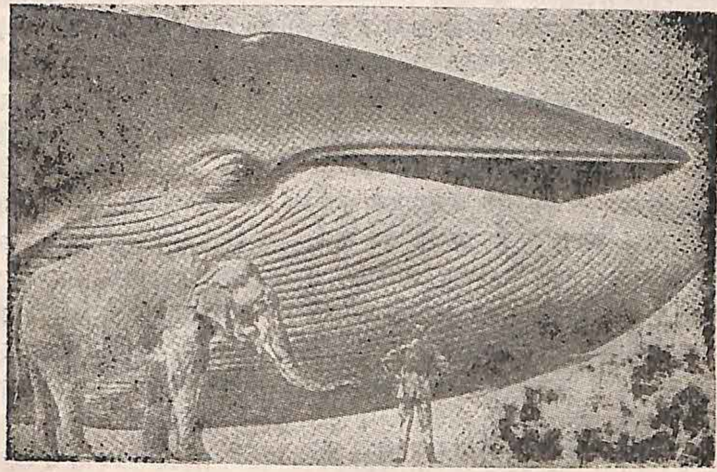
অসংখ্য মাছের নানা বৈচিত্র্যের সব কথা এখানে বলা সম্ভব নয় ; তবে সামুদ্রিক বান মাছের (eels) একটা অদ্ভুত প্রকৃতির কথা সত্যিই আশ্চর্যের। আটলান্টিকের শৈবাল সাগরে সর্পাকৃতি বান মাছ প্রচুর ডিম পাড়ে। এক একটি মাছ এক কোটিরও বেশী

ডিম দেয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই ডিম থেকে সরু সুতোর মত অসংখ্য বান মাছ বেরিয়ে আসে। সেগুলো সঙ্গে সঙ্গেই উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব দিকে চলতে শুরু করে। প্রায় তিনবছর ধরে সাঁতার কেটে কেটে এরা উত্তর সাগর ও বাল্টিক সাগর পেরিয়ে এসে ইউরোপের নদীগুলিতে ঢুকে পড়ে। নদীর স্বাদু জলের মধ্য দিয়ে অনেক দূর প্রবেশ করে এবং সেখানেই দীর্ঘদিন থাকে। পরে বেশ বড়সড় হয়ে সাবালক হলে এই সব বান মাছ আবার সাগরের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। সেই পুরানো পথ বেয়েই ওদের জন্মস্থান শৈবাল-সাগরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে আবার এদের থেকে ডিম উৎপন্ন হয় এবং সেই ডিম থেকে বানশিশুর সৃষ্টি হয়। নতুন উৎপন্ন বান মাছের বাচ্চারা আবার তাদের বাপমায়ের মতোই সেই পুরাতন পথেই নদীর দিকে যাত্রা করে। সমুদ্র আর নদীর মধ্যে বান মাছের এই পরিক্রমা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

মাছ ছাড়াও নেকটন গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে, হাঙর, স্কেইট জাতীয় জলজ প্রাণী (চিত্র ১১)। হাঙর অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং মানুষের এক পরম শত্রু। ডাঙার বাঘের সঙ্গে এদের তুলনা করা যেতে পারে। আমাদের দেশের সাগর উপকূলের অনেক জায়গাতেই যথেষ্ট হাঙর দেখা যায়। অনেক সময় এগুলো নদীতে প্রবেশ করে অনেকটা ভিতরেও চলে আসে। এগুলো প্রায়ই এক-দেড় মিটার লম্বা হয় এবং এরা খুবই হিংস্র ও শক্তিশালী। এক রকম হাঙর আছে যার মুখের চোয়ালটা অনেকটা প্রলম্বিত হয়ে দীর্ঘ "তুণ্ডে" পরিণত হয় এবং তার দুপাশে করাতের মতো খুব ধারালো শক্ত দাঁত থাকে। এই করাতের সাহায্যে নিজেকে রক্ষা করে এবং অপরকে আক্রমণ করে। এদের "করাত মাছ" বলে। এই করাতের সাহায্যে সে কখন কখনও মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়। কোন কোন হাঙরের মাথাটা একটা শক্ত হাতুড়ির মতো, আর সেই হাতুড়ির দুপাশে রয়েছে দুটো চোখ। কিন্তু সবচেয়ে বড় হাঙর হল তিমি-হাঙর। এরা শুধু প্লাংকটন খায়, মানুষের কোন ক্ষতি করে না। এরা বিশালাকার, অনেক সময় 16 মিটার লম্বা এবং ওজন 14∼15 টন। এরা সাধারণতঃ মেরু-অঞ্চলে থাকে। এসব ছাড়াও রয়েছে তিমি ; সমস্ত সামুদ্রিক জীবের মধ্যে অবশ্যই তিমির স্থান সর্বোচ্চে।

তিমি। তিমি বিধাতার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। তিমি নানা রকমের ঃ বিশালকায় নীল তিমি, ডানাওয়ালা তিমি, স্পার্ম তিমি। কোনটার দাঁত আছে, কোনটার দাঁত নেই, বিভিন্ন সব তিমি। প্রাণি-বিজ্ঞানীদের মতে, শিশুক থেকে নীল তিমি পর্যন্ত, প্রায় চল্লিশ রকমের এই স্তন্যপায়ী জলচর (Catacea) রয়েছে। এর মধ্যে গভীর সমুদ্রের নীল তিমিই প্রধান। এর মত অতিকায় জীব পৃথিবীতে আর দেখা যায়নি। একটি পূর্ণ বয়স্ক নীল তিমি লম্বায় ত্রিশ মিটার আর ওজনে 130 টন পর্যন্ত হতে পারে। চিত্র ১২ থেকে এর একটা ধারণা হতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডায়নোসরের চেয়েও নীল তিমি বৃহদাকার। এর হৃদ্‌পিণ্ডের ওজনই 180 কিলোগ্রাম, অর্থাৎ একটি বৃহদাকার মোষের চেয়েও বড়। এর মস্তিষ্কের পরিমাণ সাড়ে আট কিলোগ্রাম ! এর জিভের ওজনই একটা হাতীর ওজনের চেয়ে অনেক বেশী।

খাদ্য প্রয়োজন প্রতিদিনে এক টন। আর হবেই না কেন, ষোলমাস মাতৃজঠরে থেকে যখন সে গভীর সমুদ্রতলে জন্ম নেয় তখনই তার সাড়ে চার মিটার লম্বা দেহটির ওজন এক টন। এরপর ঐ শৈশবেই প্রতিদিনে সে অন্ততঃ তিন কিলোগ্রাম করে গতরে বাড়তে থাকে। ঐ বিরাট দেহ নিয়েও কিন্তু তিমি অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে সাঁতার কেটে চলে—প্রতিদিন শত শত মাইল, চলে যেতে পারে শত শত মিটার জলের নীচে উপরের প্রচণ্ড জলের চাপকে উপেক্ষা করে।



চিত্র ১২। তিমির বিশালত্ব

বাইরে থেকে তিমিকে মাছের মত মনে হলেও বস্তুতঃ তিমি মাছ নয়। মাছদের লেজ দেহের সঙ্গে লম্বভাবেই থাকে কিন্তু তিমিদের লেজ দেহের সঙ্গে আড়াআড়ি হয়ে থাকে। তিমির শ্বাস-প্রশ্বাস স্থলচর প্রাণীর মত ফুসফুসের সাহায্যে সম্পন্ন হয়, ওদের ফুলকো নেই। মাছের মত তিমির ডিম হয় না, সরাসরি শিশু তিমি জন্ম নেয় এবং মাতৃস্তন্যে বর্ধিত হয়। তিমির চোখ এবং কান কিন্তু দেহের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র।

তিমিরা থাকে দল বেঁধে—এদের মধ্যে পারিবারিক এবং দলগত সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। জন্ম দেবার পর প্রায় দুই বছর পর্যন্ত শিশুকে তিমি জননী যে পরম যত্ন ও স্নেহে লালন করে এবং রক্ষা করে সেটা এক আশ্চর্য ঘটনা। এমন দৃষ্টান্ত জলচর এমন কি স্থলচর জন্তুদের মধ্যেও বিরল। নানা রকম শব্দের সাহায্যে এরা পরস্পরের মধ্যে সঙ্কেত বিনিময় করে। একবার একটি ছোট্ট তিমি হঠাৎ বিপন্ন হয়ে বিপদের এক সংকেত-ধ্বনি পাঠিয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরে। মুহূর্তের মধ্যে বেশ কয়েক মাইল দূর থেকে অন্ততঃ সাতাশটি স্ত্রী-তিমি ছুটে এল তার কাছে। দুটি তিমি আহত তিমিটির নীচে গিয়ে পিঠে করে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল, অন্যগুলো চারদিক ঘিরে এদের পাহারা দিয়ে এগোতে লাগল। এ দৃশ্যটি অনতিদূরের এক জাহাজ

থেকে ক্যামেরায় তুলে রাখা হয়েছে। এরকম ঘটনার বহু দৃষ্টান্ত যাঁরা তিমি-জগতে ঘোরাফেরা করেন তাঁদের লেখাতে রয়েছে। নিশ্চিত বিপদের মুখেও কোন তিমি আহত সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে ছেড়ে যায় না। এজন্য শিকারীরা প্রায়ই স্ত্রী-তিমিকে বিস্ফোরক হারপুন্ দিয়ে প্রথমে আঘাতে করে। তার সঙ্গী পালিয়ে যায় না, সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাই সেটিকেও সহজে শিকার করা সম্ভব হয়।

এক একটি তিমি এক বিপুল সম্পদের খনি। একটি মাত্র দাঁতাল স্পার্ম তিমি থেকে তেল আর চর্বি পাওয়া যায় কুড়ি টনেরও বেশী। এই তেলের থেকে তৈরী হয় সাবান, মার্গারিন প্রভৃতি। পেশীর মাংস থেকে গৃহপালিত পশু-পাখীর খাবার পাওয়া যায়। কন্ডরা আর শিরা গ্রন্থিগুলো থেকে সার্জনের শল্য-চিকিৎসার সুতো, ঘোড়ার চাবুক ইত্যাদি থেকে শুরু করে টেনিস-র‍্যাকেটের স্ট্রীং পর্যন্ত নানা জিনিস তৈরী হয়। অস্থিচূর্ণ জমির ফসফেট সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। জিলাটিন আর আঠা জাতীয় পদার্থগুলো জেলী তৈরীতে, ফটোগ্রাফির ফিল্মে লাগে। তাছাড়াও ব্রাসের কাঠি, জুতোর পালিশ, বোতাম তৈরীতে অনেক সময় বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করা হয়। মোট কথা, তিমির কোন কিছুই ফেলে দেওয়া হয় না। বলা বাহুল্য, মানুষের দৃষ্টি এর উপর পড়বেই, তাই তিমি শিকারের আয়োজন বহুধা-বিস্তৃত। কিন্তু মানুষের ত লোভের শেষ নেই। মানুষের অদূরদৃষ্টির ফলে যেমন অনেক সুন্দর স্থলজন্তু লোপ পেয়ে গেছে, তিমিরও প্রায় সেই অবস্থা। 1935-এ নীল তিমির মোট সংখ্যা ছিল অন্ততঃ এক লাখ, সেই সংখ্যা নেমে এসেছে মোট ছয়শ'তে 1970-এ। মানুষ কি বিপুল ধ্বংস করেছে এই প্রাণীর! নীল তিমি এখন কদাচিৎ দেখা যায়। ডানা-ওয়ালা তিমির স্থান নীল তিমির পরেই। তার উপরে এখন নজর পড়েছে—1946-এ এদের সংখ্যা ছিল 200,000 আর 1970-এ সেটা হয়েছে 35000। তিমির কথা বলতে গিয়ে অনেকদূর চলে এসেছি, আবার পুরানো কথায় ফিরে যাওয়া যাক।

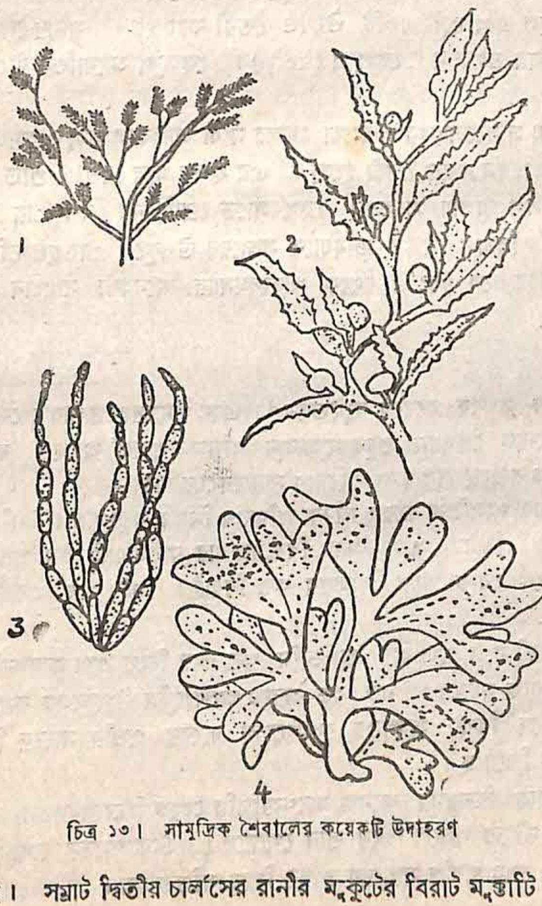
কোটি কোটি বছর আগে মাটির উপর যেসব জন্তুর আবির্ভাব ঘটেছিল, তাদের অস্তিত্ব এখন আর নেই। নানা প্রতিকূল অবস্থায় দুর্বার বাধা-বিপত্তির সঙ্গে যুঝতে গিয়ে সেই সব প্রাণীর বহু পরিবর্তন হয়ে আজকের দিনের নর, বানর, পশু-পাখীর উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু সমুদ্রে তাপমাত্রার পার্থক্য ছিল কম। খাদ্য সংগ্রহের এবং চলাফেরার কষ্ট ছিল না। তাই সেখানকার প্রাণীর বিবর্তন হয়েছে কম। যে "সিলাকান্থ মাছ" (coelacanth), থেকে সেই আদিমকালে স্থলচর প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়, আকারে ছোট হলেও আজও সেই সিলাকান্থ মাঝে মাঝে দেখা যায়। স্থলভাগের ডায়নোসরের মত তারা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যসংকট যে রকম তীব্র হচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে যে আমাদের সমুদ্রের জৈব সম্পদের উপর নির্ভর করতে হবে সেটা সুনিশ্চিত। একদিন জুয়ো-প্লাংকটন আর ছোট ছোট মাছ, চিংড়ি এসবই আমাদের খাদ্যের যোগান দেবে। কিন্তু ভান্ডার থেকে শুধু লুঠ করে আনলেই চলবে না, সেখানকার ফসল যেন অব্যাহত থাকে তারও সুষ্ঠু পরিকল্পনা চাই। কি ভাবে উদ্ভিজ্জ-প্লাংকটন সহজে আবার নিরন্তর তৈরী হবে তার ব্যবস্থাও প্রয়োজন হবে। তা না হলে

একবার সমুদ্রের প্রাণসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে ভাণ্ডার আর বেশীদিন পূর্ণ থাকবে না। এর জন্যে সমস্ত সমুদ্রকেই সারা বিশ্বের যৌথ সম্পদ-ভাণ্ডার করতে হবে।

প্রাচীনকালে গ্রীক এবং রোমক সভ্যতার যুগেও উপকূলের সাগরে ও নদীর মুখে শুক্তি, কাঁকড়া প্রভৃতির চাষ হত। আরিস্টোটল এবং প্লিনি এই সব চাষের বিবরণ লিখে রেখে গেছেন।

সমুদ্রের জৈব উৎস থেকে আরও দুইটি জিনিষ আমরা সংগ্রহ করি। একটি মুক্তা আর অপরটি আয়োডিন। মুক্তা থাকে বিশেষ কতকগুলো শামুক-জাতীয় প্রাণীর দেহে। বর্ণাঢ্য ঔজ্জ্বল্যের জন্য রত্ন হিসাবে মুক্তা খুবই সমাদৃত। কৃত্রিম উপায়ে আজকাল মুক্তা তৈরী হয় বটে, তবে আসল মুক্তার কৌলীন্য এখনও রয়েছে। পারস্য উপসাগরের বাহেরিন দ্বীপের কাছে, সিংহলের উপকূল অঞ্চলে, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউ-গিনির মধ্যবর্তী সমুদ্রে মুক্তা বেশী পাওয়া যায়। কোন কোন মুক্তার ঐতিহাসিক



চিত্র ১৩। সামুদ্রিক শৈবালের কয়েকটি উদাহরণ

প্রসিদ্ধি আছে। সম্রাট দ্বিতীয় চার্লসের রানীর মুকুটের বিরাট মুক্তাটি ছিল সৌন্দর্যে

অতুলনীয়। মেরী অ্যান্টোয়ানেটকে ফরাসী সম্রাট লুই যে মুক্তাহার উপহার দিয়েছিলেন তার খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। পারস্য সম্রাট একটি অপরূপ মুক্তার জন্য সেই যুগেই (1633) ব্যয় করেছিলেন 64000 পাউন্ড।

সামুদ্রিক উদ্ভিদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী হচ্ছে ফাইটো-প্লাংকটন। এর অপরিসীম গুরুত্বের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর উদ্ভিদ, লতাপাতার আগাছা দেখা যায়। সামুদ্রিক উদ্ভিদের ফুল বা ফল নেই। ছত্রাক বা পর্ণাঙ্গও সমুদ্রে নেই। প্রধানতঃ লাল বা বাদামী অ্যালজী (algae) সমুদ্রে বেশী দেখা যায় (চিত্র ১৩)। এই অ্যালজীর ঘন জঙ্গল দেখা যায় বিশেষ করে আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের Sargasso Sea বা শৈবাল-সাগরে। অনেক সময় এই শৈবালের এক একটি 30-40 মিটার দীর্ঘ হয়। প্রতি বছর হাজার হাজার টন এই সকল উদ্ভিদ সংগ্রহ করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্বাঞ্চলে এই শৈবাল পশু-খাদ্যের সঙ্গে যথেষ্ট মিশান হয়। সমুদ্র-শৈবাল থেকে আগর-জেলি, ভিনিগার, কোন কোন কোহল এবং দুই একটি ঔষধও তৈরী করা হয়। সমুদ্র-শৈবাল পুড়িয়ে যে ভস্ম পাওয়া যায় তাকে বলে কেল্‌প (kelp)। কেল্‌প আয়োডিন উৎপাদনের এক প্রধান উৎস।

কৃত্রিম উপায়ে সূর্যালোকের সাহায্যে জলের মধ্যে আজকাল সবুজ অ্যালজী ক্লোরেলা (chlorella) উৎপাদন করার চেষ্টা হচ্ছে। এর ফলন খুব বেশী—প্রতি হেক্টারে প্রায় 40 টন সবুজ ফসল পাওয়া সম্ভব। ক্লোরেলাতে প্রোটিনের অংশ প্রায় 50%, যেখানে গমে প্রোটিনের পরিমাণ 12%। ভবিষ্যতে সাগরের উপকূলে এবং হ্রদগুলিতে বিস্তীর্ণ ভাবে ক্লোরেলার চাষ হবে এবং এ থেকে খাদ্যসমস্যার অনেকটা সমাধান হবে—এটাই বিশ্বাস।

সমুদ্রের খনিজ সম্পদ

সমুদ্রে খনিজ সম্পদ রয়েছে দুইভাবে। এক, সমুদ্রের তলার মেঝেতে যুগযুগ ধরে যে পলল জমেছে সেখানে প্রচুর মূল্যবান খনিজ পদার্থ আছে। দুই, সাগরের জলে দ্রবিত হয়েও রয়েছে অসামান্য পরিমাণ নানারকমের লবণ।

সমুদ্রের তলার পাললিক স্তরের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা শক্ত। 20° উঃ অক্ষাংশে এই পলিস্তর 300 মিটার পুরু আর বিষুবরেখার কাছে সেই স্তর প্রায় 500 মিটার পুরু। এ থেকে বোঝা যায় পলিস্তর কত বিরাট। এই স্তর জমেছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে।

অসংখ্য নদনদী যুগ যুগ ধরে স্থলভূমি ক্ষয় করে নিয়ে এসে কাদামাটি, বালুকণা এসব হাজির করেছে সমুদ্রে। বড় বড় অদ্রাব্য অংশগুলি উপকূলের কাছেই সমুদ্রের তলায় স্থান নিয়েছে, কিন্তু সূক্ষ্মতর কণাগুলো দূরের গভীর সমুদ্রে গিয়ে তলার মেঝেতে থিতিয়ে গিয়েছে।

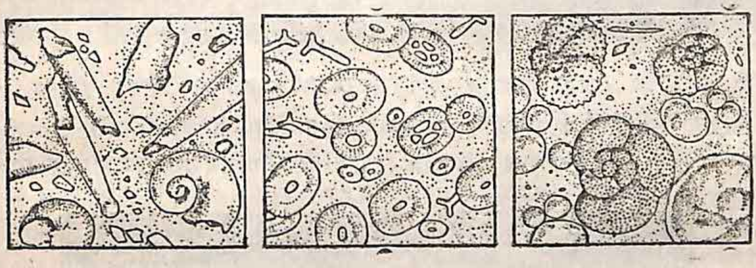
আবার সমুদ্রের ভিতরের অনেক আগ্নেয়গিরি থেকে বিস্ফোরণজাত প্রচুর সূক্ষ্ম-কণাময় পদার্থও নীচের পললে গিয়ে স্থান পেয়েছে। উল্কাপাতের ভস্মাবশেষও এসে সমুদ্রে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের তলায় গিয়ে সঞ্চিত হয়।

তাছাড়াও সামুদ্রিক জীব, যেমন প্লাংকটন, শামুক, ঝিনুক, মাছ ইত্যাদি এবং নানা জলজ-উদ্ভিদের ধ্বংস ও বিনাশের পর তাদের দেহাবশেষ এক পিচ্ছিল-কর্দমাক্ত পদার্থে পরিণত হয়। এই জৈব কর্দমও আস্তে আস্তে নীচে চুঁইয়ে পড়তে থাকে এবং পললে স্থান নেয়।

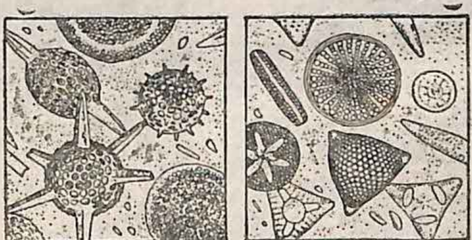
যে পলিস্তরে এই জৈবাবশেষের পরিমাণ শতকরা ত্রিশভাগের বেশী তাকে বলা হয় "সিন্ধুপঙ্ক" বা Ooze। কিন্তু, পললে জৈব পদার্থের ধ্বংসাবশেষ 30%-এর কম হলে সেগুলো "লোহিত কর্দম"। বস্তুতঃ এই লোহিত কর্দমের স্তর এক নরম এবং মিহি পলি।

লোহিত কর্দম সমুদ্রের প্রায় 102400000 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে আছে এবং সেটা অন্ততঃ 100 মিটার পুরু। লোহিত কর্দমের উপাদান প্রধানতঃ বালু (50%), অ্যালুমিনা (20%), আয়রন অক্সাইড (13%), এছাড়া আছে কিছু ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কপার, নিকেল ঘটিত পদার্থ। এই কর্দমে অন্ততঃ 10^{14} টন অ্যালুমিনিয়াম এবং 10^{12} টন কপার রয়েছে। এর সামান্য অংশও উদ্ধার করা সম্ভব হলে পৃথিবীতে এই ধাতুদ্বয়ের আর কোনদিন অভাব হবে না।

ডাই-অ্যাটম, রেডিয়োলারিয়া এবং অন্যান্য জুয়ো-প্লাংকটনের ধ্বংসাবশেষ যে সকল পলিস্তরে আসে সেই কর্দমে বালুকার ভাগ বেশী। উপকূল থেকে অনেকদূরে দক্ষিণ মহাসাগরে এটা অধিক দেখা গেছে।



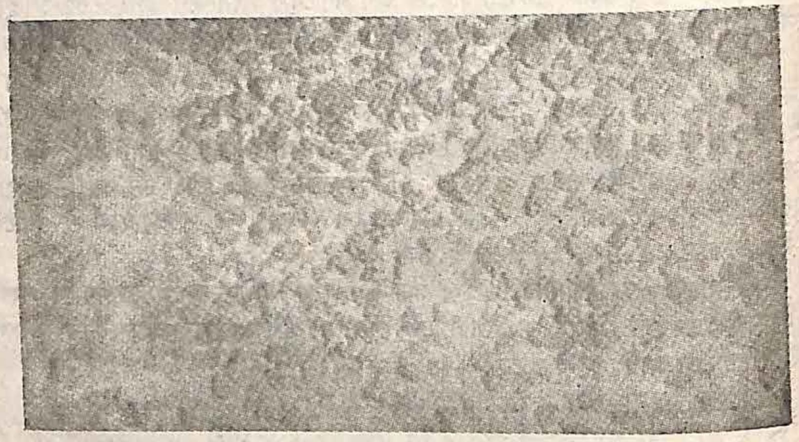
চিত্র ১৪। চুণজাতীয় নিঃসৃত কর্দম



চিত্র ১৫। বালুজাতীয় নিঃসৃত কর্দম

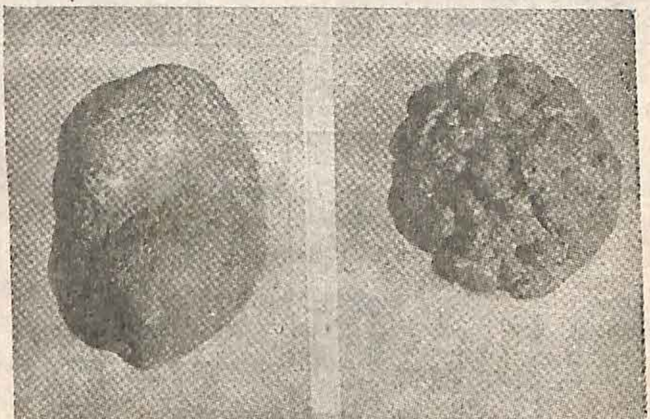
গ্লোবিজেরিনা, পেট্রোপড্ প্রভৃতি থেকে ক্ষরিত কর্দম চুণজাতীয়। এই কর্দম সমন্বিত সিন্ধুপঙ্ক প্রচুর রয়েছে সমুদ্রে, প্রায় 120 কোটি বর্গ কিলোমিটার সমুদ্রতল জুড়ে। এই স্তরও প্রায় 100 মিটার পুরু। এই চুণজাতীয় সিন্ধুপঙ্ক মহাদেশের

উপকূল থেকে কয়েকশ' কিলোমিটারের মধ্যেই থাকে। এই সিন্ধুপঙ্কে শতকরা 95 ভাগ ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকে। সুতরাং এই উত্তম ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে সহজেই সিমেন্ট প্রস্তুতির কাজে লাগান যেতে পারে এবং অদূর ভবিষ্যতে সে সম্ভাবনা যে নেই তা নয়। এখানে পললের বালুজাতীয় এবং চুণজাতীয় ক্ষরিত কর্দমের ছবি দেওয়া হল (চিত্র ১৪,১৫)।



চিত্র ১৬। প্রশান্ত মহাসাগরের মেঝেতে ম্যাঙ্গানিজ নডিউল

সমুদ্রের তলার মেঝেতে আবার রয়েছে অসংখ্য ম্যাঙ্গানিজ নডিউল (nodules) বা বড় বড় গুটি। এগুলো নানা আকারের, প্রায়ই আলু বা পেঁয়াজের মতো দেখতে—



চিত্র ১৭। ম্যাঙ্গানিজ নডিউল

সাধারণতঃ 5~20 সেমি লম্বা। কখনও কখনও বেশ বড়, এক মিটার লম্বা এবং প্রায় 4~5 কুইন্টাল ওজনের দুই একটাও দেখা যায় (চিত্র ১৬, ১৭)।

ব্রিটিশ গবেষণা-জাহাজ চ্যালেঞ্জার ১৮৭০ সালে সমুদ্রতল থেকে এদের নমুনা প্রথম সংগ্রহ করে। তখনই জানা গেল, এই সব নডিউলে যথেষ্ট ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড রয়েছে। এই শতাব্দীর গোড়াতে অ্যালবাট্রস জাহাজ এদের বিস্তারিত অনুসন্ধান করেছে। দেখা গেল, বিভিন্ন মহাসাগরের তলদেশের অনেক জায়গাতেই এরকম প্রচুর নডিউল রয়েছে, বিশেষ করে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায়। গত IGY বৎসরে (1957-58) এই গুটিগুলির জন্য বিশেষ অনুসন্ধান চালান হয় এবং নানারকম বিশ্লেষণ করা হয়।

পরীক্ষাতে দেখা গেছে, অতি ধীরে ধীরে লক্ষ লক্ষ বছরে অক্সাইড কণাগুলি সংহত হয়ে হয়ে এই নডিউলগুলি তৈরী হয়েছে। তেজস্ক্রিয় বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে, প্রতি হাজার বছরে একটি নডিউলের ব্যাস 1~2 মিমি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিভিন্ন অঞ্চলের নডিউলে ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইডের পরিমাণ বিভিন্ন। যেমন, প্রশান্ত মহাসাগরের নডিউলে ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড সাধারণতঃ 30~40% কিন্তু আটলান্টিকে তার পরিমাণ 18%। সবগুলি সমুদ্রের নমুনা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গড়ে 32% ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড, 22% আয়রন অক্সাইড, 19% বালু নডিউলে থাকে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল থেকে মাত্র 700/800 কিলোমিটার দূরের সাগরতলে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ নডিউলের এক মস্ত বড় ক্ষেত্র, প্রায় 50 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার স্থান নিয়ে। এখানকার নডিউলে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ খুব বেশী। এখানে প্রতি বর্গ মিটারে গড়ে 20~25 কিলোগ্রাম নডিউল আছে। যদি 5 কিলোগ্রাম করেও ধরা হয় তবে এখান থেকেই অন্ততঃ 2600 কোটি টন নডিউল পাওয়া যাবে। এই নডিউলের এখনও কোন ব্যবহারিক প্রয়োগ হয়নি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে এখন। কিন্তু এর একটা বিরাট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ রয়েছে। বর্তমান সভ্যতা লৌহ-নির্ভর; ভাল স্টীল তৈরী করতে ম্যাঙ্গানিজ মিশিয়ে নিতে হয়। যাদের ম্যাঙ্গানিজ নেই, যেমন যুক্তরাষ্ট্র, সমুদ্র-তলের নডিউল তাদের প্রয়োজন মিটাবে। ড্রেজার দিয়ে নডিউল তোলার উপায় ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে। নডিউল থেকে ম্যাঙ্গানিজ উদ্ধার করে লৌহ-শিল্পে চালান দেওয়া সম্ভব হবে।

এই সব নডিউলে প্রায়ই কিছু কিছু কিছু নিকেল, কপার ও কোবাল্ট থাকে। এই ধাতুগুলি খুব মূল্যবান। দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে তাহিতি দ্বীপের কাছে প্রায় 350 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এক নডিউল অঞ্চল আছে। এই নডিউলে 37% ম্যাঙ্গানিজ, 1.6% কপার, 1.6% নিকেল এবং 0·3% কোবাল্ট আছে। প্রতি বর্গমিটারে 5 কিলোগ্রাম করে ধরলে এখান থেকে অন্ততঃ 20000 কোটি টন নডিউল পাওয়া যাবে। হাওয়াই দ্বীপের কাছে এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরেও এই ধরণের নডিউল যথেষ্ট রয়েছে।

সমুদ্রতলে আর একরকম ছোট বড় পাথুরে চাঁই পড়ে থাকে—এগুলিতে থাকে ফসফরাস-ঘটিত পদার্থ। অস্ট্রেলিয়া, জাপান, স্পেন, দক্ষিণ আমেরিকা এবং যুক্ত রাষ্ট্রের নিকটবর্তী সমুদ্রতলে এদের বেশী দেখা যায়। প্রায়ই এগুলো উপকূলের কাছে অগভীর সমুদ্রের মেঝেতে পাওয়া যায়। এই সব পাথরে শতকরা প্রায় 30% ফসফরাস

পেণ্টোক্সাইড থাকে। ফসল বাড়াবার জন্য জমিতে ফসফেট সার দেওয়া হয়। খনি-থেকে-পাওয়া ফসফরাইট আকরিক থেকে ঐ সার এখন তৈরী হয়। সমুদ্রতলের এই ফসফরাস-নাডিউলও এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ইতিমধ্যেই এর হিসাব-নিকাশ শুরু হয়েছে এবং হয়তঃ শীগগীরই কোন কোন দেশে এই সমুদ্রতলের ডেলাগুলো থেকেই ফসফেট-সার সংগৃহীত হবে।

একথা এখন সবাই জানে, সমুদ্র-উপকূলের কাছাকাছি সমুদ্র-তলের মেঝে খুঁড়ে আজকাল পেট্রোলিয়াম তুলে আনা হচ্ছে। সেখানে বিপুল তৈল-ভাণ্ডার রয়েছে। মধ্য প্রাচ্যে এবং অন্যান্য উপকূলে এ ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের দেশে গুজরাটের উপকূল থেকেও তেল সংগ্রহ করা হচ্ছে। এটাকে ঠিক সমুদ্র-সম্পদ বলে গ্রহণ করা যায় কিনা সেটা বলা শক্ত।

সমুদ্রের জলে দ্রবিত লবণের মোট পরিমাণ হিসাব করে দেখা গেছে, 50,000,000,000,000,000 মেট্রিক টন। এর অধিকাংশই হচ্ছে খাদ্যলবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লবণ হচ্ছে, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম সালফেট, পটাসিয়াম সালফেট ইত্যাদি। এই সবটা লবণ শুকিয়ে স্থলভাগের উপর রাখলে সেখানে 45 মিটার পুরু একটা স্তর পড়বে। নদীগুলো বছরে $2{\cdot}73\times10^9$ টন পদার্থ স্থলভাগ থেকে ক্ষয় করে সমুদ্রে নিয়ে আসে।

সাগরজলে লবণের গাঢ়ত্ব গড়ে হাজার করা পঁয়ত্রিশ ভাগ (35 ‰) অর্থাৎ এক কিলোগ্রাম জলে 35 গ্রাম লবণ রয়েছে। এর মধ্যে খাদ্য লবণের পরিমাণ 27 ‰ ; এর পরের স্থান ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের 4 ‰ । মোটামুটি হিসাব,

সাগরজলের সহস্রাংশ (ওজনে)		মোট লবণের শতাংশে	
$NaCl$	— 27‰	Na^{+} = 30·4%	Cl^{-} = 55·2%
$MgCl_2$	— 4‰	Mg^{++} = 3·7%	SO_4^{--} = 7·7%
$MgSO_4$, $CaSO_4$	— 3‰	Ca^{++} = 1·16%	Br^{-} = 0·19%
K_4SO_4 ইত্যাদি	— 1‰	K^{+} = 1·1%	CO_3^{--} = 0·35%

সমুদ্রজলে লবণের পরিমাণ ঠিক সোজাসুজি মাপা যায় না। রসায়নবিদেরা অতি সহজে সাগরজলের ক্লোরিনের পরিমাণটা স্থির করেন। যদি ক্লোরিনের পরিমাণ x‰, হয়, তা হলে মোট লবণতা (s) হবে,

$$s‰ = 0{\cdot}03 + 1{\cdot}805\ x$$

পৃথিবীর বস্তুসম্ভার মোটামুটি 92টি মৌলিক পদার্থ থেকে উদ্ভূত। সমুদ্রজলে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী মৌলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি, সামান্য সোনা, রূপা, রেডিয়াম প্রভৃতিও আছে ঃ

সোনা 4×10^{-12}%, রূপা 15×10^{-11}%, রেডিয়াম 1×10^{-16}%, আয়োডিন 5×10^{-8}%।

এ ছাড়া অন্যান্য মৌলগুলির যৌগ এত স্বল্প পরিমাণে সাগর জলে থাকে যে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করাই দুষ্কর। অনেক সময় প্লাংকটন এবং অন্যান্য ছোট ছোট সামুদ্রিক

প্রাণী সেগুলোকে জল থেকে টেনে নেয় নিজের প্রয়োজনে এবং প্রথমে সেখানেই তাদের সনাক্ত করা হয়েছে। যেমন, রেডিয়োলারিয়া শোষণ করে স্ট্রনসিয়াম, জেলিমাছ গ্রহণ করে জিঙ্ক আর টিন ; শামুক নেয় কপার ; অ্যাসিডিয়ানে পাওয়া যায় ভ্যানেডিয়াম।

সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলের জলের লবণতা এক নয়। যে সকল অঞ্চলে বেশী বৃষ্টি হয় এবং নদীর জল বেশী নিষ্ক্রান্ত হয় সেখানে লবণমাত্রা কম হবেই। বাষ্পীভবনের উপরেও লবণতা নির্ভর করে ; বেশী জল বাষ্পীভূত হলে, লবণের গাঢ়ত্ব বেড়ে যায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৃষ্টি সাধারণতঃ খুব বেশী হয় ; বায়ুর আর্দ্রতা অধিক থাকাতে বাষ্পীভবন কম হয়। আবার এই অঞ্চলেই বড় বড় নদী যেমন, আমাজোন, কঙ্গো ইত্যাদি এসে সমুদ্রে পড়েছে, এই সব কারণে নিরক্ষীয় সাগরগুলিতে লবণমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম। নিরক্ষীয় অঞ্চলের ঠিক উত্তরে ও দক্ষিণে ($20 \sim 30°$ অক্ষাংশে) শুষ্ক আয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। সুতরাং বাষ্পীভবন বেশী, নদ-নদীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। তাই এই অঞ্চলের সমুদ্রের জল নোনা বেশী, মেরু অঞ্চলের সাগরজলে কিন্তু লবণতা হ্রাস পায়, $20 \sim 30°/_{\circ\circ}$। তার কারণ উষ্ণতা কম বলে বাষ্পীভবন কম। যথেষ্ট বৃষ্টিপাত, বিগলিত হিমবাহ থেকে প্রচুর স্বাদুজলের প্রবাহ এবং বেশ কিছু নদীর মুখ (উত্তর মেরু প্রদেশে) এখানে থাকার জন্য লবণতা হ্রাস পেয়েছে।

যে সমস্ত সাগর প্রায় সম্পূর্ণ স্থল দিয়ে পরিবৃত, তাদের লবণমাত্রা এক একরকমের। ভূমধ্যসাগরের লবণতা খুবই অধিক প্রায় $40°/_{\circ\circ}$। একমাত্র নীলনদ ছাড়া আর কোন বড় নদীর জল এখানে পড়ে না, আর শুষ্কবায়ুর জন্য এখানকার বাষ্পীভবনও অত্যধিক। সেই হেতু লবণের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। লোহিত সাগর এবং পারস্য উপসাগরের জল সর্বাধিক লবণাক্ত সেই একই কারণে। কিন্তু বাল্টিক সাগরের ব্যাপার আলাদা। সেখানে তাপমাত্রা কম, বৃষ্টি বেশী, বাষ্পীভবন বেশী নয়। তদুপরি কতগুলি ছোট বড় নদী, ওডার, ভিশ্চুলা ইত্যাদি এসে বাল্টিক সাগরে পড়েছে। ফলে এখানকার লবণমাত্রা খুবই কম, মাত্র $2°/_{\circ\circ}$; জল প্রায় স্বাদু।

সমুদ্র-জলে যে লবণ দ্রবিত থাকে তার মধ্যে ক্লোরাইড লবণই বেশী। বিভিন্ন ধরনের লবণের অনুপাত ঃ

	শতকরা ভাগ (%)
১। ক্লোরাইড (সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম)	88·5
২। সালফেট (ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম)	11·0
৩। কার্বনেট (ক্যালসিয়াম)	0·3
৪। অন্যান্য	0·2
	100%

একটা খুব আশ্চর্যের কথা, সাগর ও মহাসাগরের নানা অঞ্চলে লবণতা বিভিন্ন বটে কিন্তু সর্বত্রই উপরোক্ত লবণগুলির অনুপাত একই দেখা যায়।

এর সঙ্গে বড় বড় হ্রদের একটা তুলনা করা যেতে পারে। যে সমস্ত হ্রদের সঙ্গে নদী সংযুক্ত রয়েছে এবং নদীপথে জল প্রবাহিত হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে সে সব হ্রদের জল লবণাক্ত হতে পারে না। এ ব্যবস্থা না থাকলেই হ্রদের জল লাবণ হবে।

সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে সমস্ত জলভাণ্ডার হ্রদে পরিণত হয়েছে, তাদের জল ত লবণাক্ত হবেই। ক্যাম্পিয়ান সাগর, কৃষ্ণসাগর লবণাক্ত, কিন্তু রাশিয়ার বড় বড় নদী এসে পড়েছে বলে এদের লবণতা অপেক্ষাকৃত কম। এদের চেয়ে বেশী দূরে নয়, মরু সাগর (Dead Sea) রয়েছে—এর লবণমাত্রা সর্বাধিক 240 ‰। মরুর সন্নিকটে তাই তাপমাত্রা বেশী, বৃষ্টির একান্ত অভাব, বাষ্পায়নের আধিক্য এবং কোন নদীর উল্লেখযোগ্য দান নেই বলে এর জল এত লবণাক্ত।

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, আর তা থেকে ম্যাগনেসিয়াম ধাতু, ব্রোমিন এবং সর্বোপরি খাদ্য লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড)—এই কয়টি পদার্থই প্রধানতঃ সমুদ্র-জল থেকে সংগ্রহ করা হয়। বাষ্পীভবনের ফলে সমুদ্রজল গাঢ় হলে প্রথমে খাদ্যলবণ কেলাসিত হয়। অবশিষ্ট তরল শেষদ্রব থেকে আংশিক কেলাসিত করে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট উদ্ধার করা হয়। এটিকে চিকিৎসকেরা প্রচুর ব্যবহার করেন। সমুদ্র-থেকে-পাওয়া ম্যাগনেসিয়াম যৌগপদার্থ থেকে আজকাল, বিশেষতঃ আমেরিকাতে লক্ষ লক্ষ টন ম্যগনেসিয়াম ধাতু তৈরী হচ্ছে। উড়োজাহাজে এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে বর্তমানে অনেকস্থলে ম্যাগনেসিয়াম মিশ্রিত ধাতুসংকর ব্যবহার করা হয়। সমুদ্রজলে খানিকটা ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইডও রয়েছে। সামান্য হলেও সেটাকে যত্ন করে উদ্ধার করে তা থেকে অতি মূল্যবান ব্রোমিন তৈরী করা হয়। ব্রোমিন নানা কাজে লাগে, বিশেষ করে জ্বালানি-তেলের সঙ্গে যে ইথিলীন ব্রোমাইড মেশান হয় সেটা তৈরী করার জন্য এই ব্রোমিন খুব প্রয়োজন। এক টন সমুদ্র-জল থেকে পঞ্চাশ গ্রামেরও কম ব্রোমিন পাওয়া যায়। এত স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও উন্নত ধরণের রাসায়নিক পদ্ধতির প্রয়োগে এর উৎপাদন লাভজনক করা সম্ভব হয়েছে।

এবার খাদ্যলবণের কথায় আসা যাক। খাদ্যলবণ, সচরাচর যাকে "লবণ বা নুন" বলা হয়, সেটা আমাদের দেহের পক্ষে একান্ত দরকার। আমাদের শরীর থেকে মূত্র এবং ঘামের সঙ্গে দ্রবিত অবস্থায় 2·5% লবণ বের হয়ে যায়, দেহের লবণের এই ক্ষতির পরিপূরণ না হলে শরীরে নানারকম ব্যাধি দেখা দেয়। সেইজন্যেই আমাদের খাদ্যের এক অপরিহার্য উপাদান লবণ। খাদ্য উপাদান ছাড়াও আরও নানা কাজে লবণের প্রয়োজন রয়েছে। সোডা (কাপড় কাচার জন্য), কষ্টিক সোডা (সাবান তৈরী করার জন্য), সোডিয়াম সালফেট (ঔষধের জন্য) ইত্যাদি আমরা প্রচুর ব্যবহার করি। আর এসব তৈরী করার কাঁচামাল হল সমুদ্র-থেকে-পাওয়া সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ। মাছ, মাংস, হ্যাম্ ইত্যাদির পচন রোধ করে অনেকদিন রাখতে হলে নুনের মধ্যে রাখতে হয়। আমাদের দেশের নোনা ইলিশ এভাবে অনেকদিন থাকে। লবণকে বিশ্লেষিত করলে সোডিয়াম ধাতু আর ক্লোরিন পাওয়া যায়। শিল্প-প্রয়োজনে উভয়েরই যথেষ্ট সমাদর। ক্লোরিনের বিশেষ চাহিদা ব্লীচিং-পাউডার তৈরী করার জন্য এবং কাগজ-শিল্পে। আমাদের মাছের বাজারে গেলে প্রায়ই দেখা যায় বরফের সঙ্গে নুন মিশিয়ে তাতে মাছ রাখা হয়। নুন মিশালে বরফের গলনাঙ্ক অনেক কমে যায়। তাই অতি-শীতল "হিমায়ক মিশ্র" হিসাবে নুন-বরফ ব্যবহার করা হয়।

সবদেশের লবণের চাহিদার প্রায় সবটাই সমুদ্র থেকে মেটান হয়। শুধু কোন কোন যায়গায় কিছু লবণের খনি আছে। যেমন, পাঞ্জাবের কলাবাগ আর খেওরা খনি থেকে সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়। যে সব দেশের সমুদ্র-উপকূল নেই, তাদের অপর দেশ থেকে লবণ আমদানী করতেই হয়। নেপাল, তিব্বত, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের সমুদ্র-উপকূল নেই, এদের লবণের জন্য পরমুখাপেক্ষী হতে হয়। এসব দেশে লবণ অত্যন্ত মূল্যবান। শোনা যায়, একসময় রোমান সৈন্যদের খানিকটা বেতন কেটে নিয়ে তার বদলে নুন দেওয়া হত। লবণের জন্য কোথাও কোথাও পৃথক বৃত্তি দেবার রীতি ছিল, এর নাম ছিল "স্যালারিয়াম"। এই থেকেই বেতন অর্থে "স্যালারি" (Salary) কথাটার উদ্ভব হয়েছে।

সাগরের জল থেকে লবণ তৈরী করাটা যেমন সহজ তেমন সস্তা। উপকূলের কাছে বাঁধ দিয়ে বড় বড় পুকুরের মত চৌবাচ্চা তৈরী করা হয়। জোয়ারের সময় জল এসে সেখানে জমে। খানিকটা থিতিয়ে যাবার পর সেই নোনা জলকে পাম্প করে ভিতরের দিকে অপর চৌবাচ্চায় পাঠান হয়। কয়েকদিন সেখানে থাকলে সূর্যের তাপে অনেকটা জল উবে গেলে জিপসাম ও চকের দানা নীচে পৃথক হয়ে পড়ে। এবার উপর থেকে নোনা জল নিয়ে অগভীর (2" গভীর) বড় বড় ট্যাঙ্কে রাখা হয়। এখান থেকেও সূর্যের উত্তাপে জল বাষ্পীভূত হতে থাকলে লবণের দানা কেলাসিত হতে থাকে। হাতায় করে সেই লবণের পলি তুলে এনে শুকিয়ে নিলেই বাজারের নুন তৈরী হল। আমাদের দেশের লবণ তৈরীর বড় কারখানা-গুলি গুজরাট, মহারাষ্ট্রের উপকূলে। সেখানে এই রকম করেই লবণ তৈরী হয়। যেখানে বৃষ্টিপাত বেশী সেখানে ঘন লবণোদক নিয়ে বড় বড় কড়াতে আগুনে জ্বাল দিতে হয়। যথেষ্ট গাঢ় হলে কড়াইয়ের তলায় লবণ জমে।

বহু প্রাচীন যুগ থেকেই আমাদের দেশে সমুদ্রজল থেকে লবণ তৈরী হয়ে আসছে। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে আইনের বলে এদেশে লবণ তৈরী নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, ইংল্যাণ্ডের লবণ এখানে এনে বিক্রীর সুযোগ দেবার জন্য। পরাধীনতার এমনই মহিমা। তা ছাড়া লবণের উপর শুল্কও বসান হয়েছিল। ফলে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন এক মন লবণ তৈরী করতে খরচ পড়ত দশ পয়সা, তখন আমাদের কিনতে হত প্রতি সের দশ পয়সায়। এই নিয়ে 1930-এ মহাত্মা গান্ধী লবণ-সত্যাগ্রহ করেন। এই উপলক্ষেই তাঁর সেই বিখ্যাত ডাণ্ডি পদযাত্রা ও শেষ পর্যন্ত গান্ধী-আরউইন চুক্তি। ঐ চুক্তি যে শুধু লবণ-তৈরীর কিছু সুবিধা এনে দিয়েছিল তাই নয়। সারা ভারতবর্ষে সেই পদযাত্রা যে রাজনৈতিক চেতনা এনেছিল ইতিহাসে তার তুলনা বিরল।

সামুদ্রিক জীবের পুষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজন নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস। এই দুয়েরই অনেকরকম যৌগ জলে দ্রবিত অবস্থায় রয়েছে। নদীর কাছ থেকে সমুদ্র অনেকটা নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের যৌগ প্রতিনিয়ত পায়। আবার সামুদ্রিক প্রাণীর বিনাশ বা ধ্বংসের পরে তাদের দেহাবশেষের উপর ব্যাক্টিরিয়ার ক্রিয়ার ফলেও ঐসকল পদার্থের যথেষ্ট উৎপাদন হয়।

খনিজ লবণ ছাড়াও নানারকম জৈবপদার্থ (organic matter) মহাসিন্ধুতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সমুদ্রের সমস্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদে মিলে যে মোট জৈব-পদার্থ আছে তার তিনশতগুণ জৈবপদার্থ জলে দ্রবিত হয়ে আছে। প্লাংকটন ও ছোট ছোট প্রাণীর উৎপাদন ও বৃদ্ধিতে ঐসব জৈবপদার্থের অবদান অসামান্য।

খনিজ এবং জৈবসম্পদ ছাড়াও সমুদ্র শক্তির এক অশেষ ভাণ্ডার। এই শক্তিকে মানুষ এখনও ভালভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয় নি। সমুদ্রের উপরে সারাক্ষণ ঢেউয়ের পর ঢেউ ছুটে চলেছে, তরঙ্গ এসে নিরন্তর উপকূলে আছড়ে পড়ছে। এই তরঙ্গ-প্রবাহে রয়েছে প্রচুর গতীয় শক্তি। যার বেশীর ভাগটাই এসেছে বায়ুপ্রবাহ থেকে। তা ছাড়া রয়েছে জোয়ার-ভাটার প্রবাহ। কিন্তু এই গতীয়-শক্তিকে তাপ বা অন্য কোন শক্তিতে সার্থক রূপান্তর করা যায় নি। একথা সকলেই জানে, তাপশক্তি উচ্চতর উষ্ণতা থেকে আপনা থেকেই নিম্নতর উষ্ণতায় চলে যায়। তাপগতি-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে উপযুক্ত যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করে প্রবাহিত তাপের খানিকটা কাজে লাগান সম্ভব। যেমন, কয়লা পোড়ান থেকে পাওয়া তাপ আমরা স্টীম-ইঞ্জিনের সাহায্যে ব্যবহার করে রেলগাড়ী চালাতে পারছি। সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেশী, সমুদ্রতলের তাপমাত্রা কম। সুতরাং উপযুক্ত যন্ত্র উদ্ভাবন করতে পারলে এই দুই অসম তাপমাত্রার স্রোত থেকে শক্তি আহরণ করে কাজে লাগান যেতে পারে। এখনও পর্যন্ত সেরকম কিছু করা সম্ভব হয়নি। যদি করা যায়, তবে একদিন প্রায় নিখরচায় জাহাজ চালান যাবে। প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, ফ্রান্সের রান্‌স্‌ নদীর মোহনায় "টাইডেল টারবাইন" বসিয়ে খানিকটা শক্তি জোয়ারপ্রবাহ থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে।

সমুদ্র ছিল বলেই প্রাচীনকালে বিভিন্ন সভ্যতার সঙ্গে আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছিল; যেমন, হিন্দুসভ্যতার সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার। অথবা মিশরীয়, গ্রীক ও রোমক সভ্যতার প্রসার সহজ হতে পেরেছিল। সমুদ্রের সহজ নাব্যতার জন্যেই প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি শ্যাম, মালয়, জাভা-সুমাত্রা পর্যন্ত, আবার অপরদিকে পারস্য, আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পেরেছিল। আজও দেশে দেশে সংযোগের এবং পণ্য-বিনিময়ের প্রধান উপায় সমুদ্র পথ। সভ্যতার প্রগতিতে সমুদ্রের অবদান অপরিসীম। সমুদ্রপথ না থাকলে আজ এখান থেকে হিমালয় পেরিয়ে স্থলপথে জাপানে যেতে হলে সেটা যে কী ভয়াবহ ব্যাপার হত তা ভাবা যায় না। উড়োজাহাজের দক্ষতা সমধিক, কিন্তু প্রয়োগ সীমিত।

ভারতের রয়েছে দীর্ঘ সমুদ্র-উপকূল। তার জলবায়ু, তার বাণিজ্য, তার বন্দর উন্নয়ন, এমনকি তার নিরাপত্তাও সমুদ্রের উপর নির্ভর করে। সমুদ্র থেকে আমাদের আরও খাদ্য সংগ্রহও প্রয়োজন। এজন্যে আমাদের সমুদ্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। সমুদ্র-বিজ্ঞানের চর্চা প্রায় এদেশে শুরুই হয় নি, এ বিষয়ে উদ্যম ও উৎসাহের একান্ত প্রয়োজন।

সমুদ্রের দূষণ

আজকালকার নানাধরণের বিস্ফোরণের ফলে সমুদ্র-জল বিষাক্ত হচ্ছে ; প্রাণবস্তুর

অপচয় ও বিনাশ ঘটছে। এটা বন্ধ না হলে এই বিপুল জৈবসম্পদ ভবিষ্যতে আর আমাদের উপকারে আসবে না।

সমুদ্রের জলে দ্রবিত অবস্থায় পটাসিয়াম, ইউরেনিয়াম, রুবিডিয়াম ইত্যাদির অতি সামান্য কিছু আইসোটোপ আছে যৌগরূপে। এদের তেজস্ক্রিয়তা এত সামান্য যে তা'তে জলজ প্রাণী বা মানুষের কোন অপকার হয় না। কিন্তু বিকিনি প্রবাল দ্বীপ-পুঞ্জের কাছে অধুনা যে পারমাণবিক বিস্ফোরণের মহড়া চলছে তার ফলে সমুদ্র খুবই দূষিত হচ্ছে। ওখানে একবার একটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করার পর দেখা গেল, সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের তেজস্ক্রিয়তা দশলক্ষগুণ বেড়েছে এবং চারমাস পরেও বিকিনি থেকে 900 কিলোমিটার দূরে তেজস্ক্রিয়তা সাধারণের চেয়ে তিনগুণ বেশী ছিল। তেজস্ক্রিয়তা সব চেয়ে বেশী ঘনীভূত হয় ফাইটো-প্লাংকটনে এবং তার ফলে জলের সমস্ত জৈবজগতে। বিস্ফোরণজাত তেজস্ক্রিয় স্ট্রনসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি মাছের হাড়ের মধ্যে স্থান পায় এবং সেখানে দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। তেজস্ক্রিয় আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থিতে প্রবেশ করে। এই সকল তেজস্ক্রিয় মাছের মাধ্যমেই বিষ মানবদেহে আসে। শুধু বর্তমানের নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরের উপরেও এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

আবার শক্তি-উৎপাদনের জন্য অনেক পারমাণবিক রি-অ্যাক্টার সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। সেখান থেকে যথেষ্ট তেজস্ক্রিয় অবশেষ (wastes) উৎপন্ন হয়। কোন কোন উন্নত দেশ সেই অবশেষ ড্রামে আবদ্ধ করে সমুদ্রের গভীর খাতে নিক্ষেপ করে। দীর্ঘকাল পরে এই ড্রাম ভেঙে গিয়ে সমুদ্রজলকে দূষিত করে তোলার যথেষ্ট সম্ভাবনা। অগ্রগতির সঙ্গে এই অবশেষের পরিমাণও শত শতগুণ বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং সমস্ত জাতি মিলে এর বিকল্প ব্যবস্থা এখনই করা প্রয়োজন।

সমুদ্র-দূষণের আরও একটি বড় কারণ আছে। বর্তমানে হাজার হাজার তেলের ট্যাঙ্কার সমুদ্রে চলছে। তাছাড়া সব জাহাজেই প্রচুর তেল ব্যবহার হয়। জাহাজ পরিস্করণের সময় অনেকটা তেল সমুদ্র জলে মিশে যায়। একটা মোটামুটি হিসাবে দেখা গেছে বছরে এভাবে 3,000,000 ঘন মিটার তেল সমুদ্রজলে চলে আসে। এর জন্য জৈবসম্পদের প্রচুর ক্ষতি হয়। জাপানের সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে তাদের বন্দর উপকূলে জাহাজ চলাচলের ফলে বছরে 5,000,000 ইয়েন মূল্যের মৎস্য-সম্পদ নষ্ট হয়। উত্তর আমেরিকার আটলাণ্টিক উপকূলের কাছে আজকাল মাছ দুর্লভ হয়ে উঠেছে, তার কারণ ওখানে সর্বদা জাহাজের আনাগোনা এবং তাদের তেল থেকে উপকূলের সমুদ্র-জল খুবই দূষিত।

বছরে মোট উৎপাদিত আড়াই হাজার মিলিয়ন টন উৎপাদিত তেলের মধ্যে 1700 মিলিয়ন টনই ট্যাঙ্কারে করে সমুদ্রের উপর দিয়ে নানাস্থানে পাঠান হয়। সেখান থেকে অন্ততঃ দুই মিলিয়ন টন তেল সমুদ্র গর্ভে যায় ; অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় একশত লিটার তেল সমুদ্রে মিশছে। এ ছাড়া আছে ট্যাঙ্কারের দুর্ঘটনা। টরি ক্যানিয়ান নামক ট্যাঙ্কারটি পারস্য উপসাগর থেকে ইংলণ্ডে যাচ্ছিল তেল নিয়ে (1967)। পথে নিমজ্জমান শৈলশ্রেণীতে ধাক্কা খেয়ে ছটি ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে প্রায় সাতাশ হাজার টন তেল

পড়ে যায়। তীব্র তৈল-দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিশেষজ্ঞেরা ভাঙা জাহাজটিকে বোমা ছুঁড়ে ধ্বংস করে বাকী তেলে আগুন ধরিয়ে দেন। এই রকম আরও দুর্ঘটনা ঘটেছে 1974 এবং 1978 সালে, তাতে যথাক্রমে 5000 ও 1000 টন তেল সমুদ্রজলে মিশেছে।

আজকাল আবার উপকূলের কাছে সমুদ্রগর্ভ থেকে তৈল উত্তোলন করা হচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারা উপকূলে, আমাদের বম্বে-হাইয়ে, ইংল্যাণ্ডের উত্তর সাগরে ও অনান্য দেশে এমনি তেল সংগ্রহ হচ্ছে। তৈলকূপ খননের সময়, ট্যাঙ্কারে তেল ভরার সময় সর্বদাই খানিকটা তেল সমুদ্রজলে মিশে সেটাকে দূষিত করে।

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে কলকারখানা, ইঞ্জিন প্রভৃতি থেকে যে প্রচুর বিষাক্ত দ্রব্য ও আবর্জনার সৃষ্টি হয় সেগুলি শেষ পর্যন্ত নদী-নালা বেয়ে সমুদ্রে স্থানান্তরিত হয়। ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মে কিছুটা জৈব কলুষ পরিষ্কৃত হয়। কিন্তু অধিকাংশ বিষাক্ত দ্রব্যই সাগরে সঞ্চিত হয়। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত ঃ আমাদের মোটর কার বা বাসের ইঞ্জিনের তেলে যথেষ্ট লেড টেট্রাইথাইল মেশান হয়। এর থেকে যে সীসাঘটিত বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হয় সেটা শেষ পর্যন্ত সাগরে পেঁছিয়। গত বিশ বছরে উপকূলের জলে সীসার পরিমাণ দশগুণ বেড়েছে। 1950-এর দশকে জাপানের মিনামাতা উপসাগরের জলে স্থানীয় প্লাস্টিক কারখানা হতে পারদ-সমন্বিত ধোয়ানী ফেলা হত সমুদ্রের জলে। এই জল মাছের মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। এই দূষণের ফলে ঐ অঞ্চলের বহু লোক পঙ্গু হয়ে যায়। সমুদ্র-দূষণে শুধু যে মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণী ধ্বংস বা বিকৃত হয় তা নয়, তার ফলে মানুষেরও অকল্যাণ হয়।

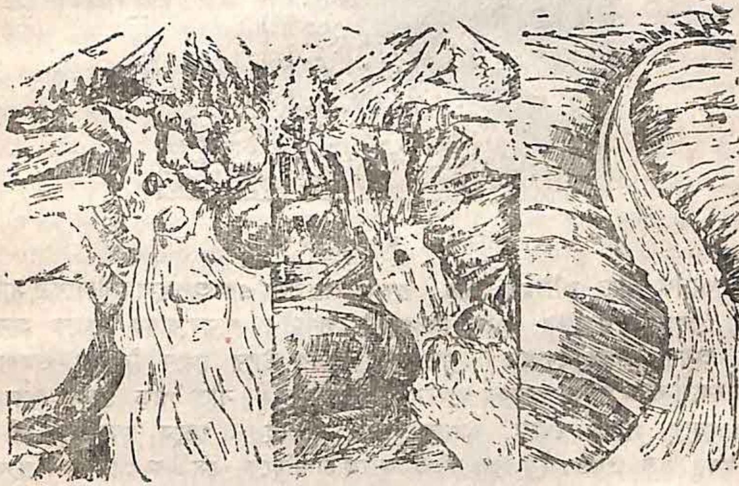
৫। নদীর কথা

সমুদ্র থেকে এবার নদীর কথায় আসা যাক। সমুদ্র গর্বিত সম্রাট, আর নদী মঙ্গলময়ী গৃহলক্ষ্মী। সমুদ্রকে আমরা দূর থেকে দেখি, তার বিশালতা বিস্ময় জাগায় মনে। কিন্তু নদী আমাদের অতি নিকট, প্রতিদিনের ঘরকন্নার সাথী। সমুদ্রের আছে অফুরন্ত সম্পদের ভান্ডার, নদী কিন্তু তিল তিল করে যা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে সব উজাড় করে দিয়ে যায় সমুদ্রকে, এমনকি নিজেকেও। সমুদ্র রাজদন্ড নিয়ে সমস্ত প্রকৃতিকে শাসন করতে ব্যস্ত, আর নদী ত্যাগ আর সেবা দিয়ে সকলকে আপন করে নিতে চায়। সমুদ্র দেয় অসীম অনন্তের, উদারতার উপলব্ধি ; নদী দেয় স্নেহ, আনন্দ, জীবনের অমৃত।

উঁচু উঁচু পাহাড়ের উপরের তুষারস্তূপ হিমবাহ হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে হিমরেখার তলে এলে সেটা গলতে শুরু করে। হিমবাহ থেকে তখন অনেক ক্ষীণ জলধারা পড়তে থাকে। এই সব জল ধারা একত্র হয়ে সৃষ্টি করে জলস্রোতের। এরকম অনেক জলস্রোত একত্র মিশে গিয়ে পাহাড়ী নদীতে পরিণত হয়। ওদিকে আবার মেঘ থেকে বৃষ্টি নামে মাটির উপরে আর পাহাড়ের উপরে। স্বভাবতঃই বৃষ্টির জল যে দিকটা ঢালু সেই দিকেই বয়ে যায়। এই জলস্রোতও

তুষার-থেকে-আসা জলস্রোতের সঙ্গে প্রায়ই মিশে যায়। নদী তখন প্রশস্ততর হতে থাকে। পর্বতের সানুদেশ অতিক্রম করে বহতা নদীর ধারা এসে সমতল ভূমিতে নামে। উঁচু থেকে নেমে আসার ফলে এই জলস্রোত প্রবল বেগে চলে। ফলে, ঢালু সমতলের দুইপাড় ভেঙ্গে আর তলার দিকে খাত তৈরী করে নদী প্রবাহিত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সাগরে বা কোন হ্রদে গিয়ে নিজেকে বিসর্জন দেয়।

পাহাড়ের গা বেয়ে জলস্রোত যখন নামতে থাকে তখন সেটা শীর্ণ বটে কিন্তু ঢাল বেশী থাকার জন্য তার বেগ প্রচণ্ড। এই খরস্রোতের প্রধান কাজ হচ্ছে শিলার ক্ষয় সাধন করা। শিলাখণ্ডগুলিকে ক্ষয়ে ক্ষয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে জলস্রোত খাত তৈরী করে নামতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ছোট বড় পাথরও নেমে আসে। এই শিলাখণ্ডগুলি প্রবল ঘর্ষণের ফলে ক্ষয়ে গিয়ে মসৃণ উপলখণ্ডে বা নুড়িতে পরিণত হয়। পাথরের নুড়ি স্রোতের সঙ্গে নদী যেখানে সমতল ভূমিতে প্রবেশ করে সেখানে এসে জমে (চিত্র ১৮)।

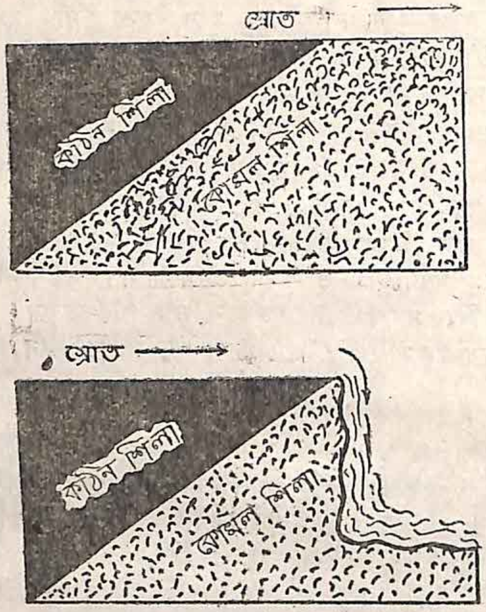


চিত্র ১৮। পাহাড়ী নদের খাত সৃষ্টি

সূক্ষ্ম বালু ও ধূলিকণা জলস্রোতের সঙ্গে বাহিত হয়ে আসে। জলে কিছু অক্সিজেন ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড দ্রবিত থাকে, নরম শিলা এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও ক্ষয়িত হয়ে যায়।

আর একটি ব্যাপার মাঝে মাঝে দেখা যায়। যদি পর্বতের অধিত্যকায় কঠিন শিলা এবং কোমল শিলার স্তর থাকে, উপর দিয়ে জলস্রোত বয়ে যাবার সময় কঠিন শিলার স্তর তেমন ক্ষয় হয় না। কিন্তু কোমল শিলা খুব বেশী ক্ষয়ে যায়। এর ফলে কোমল শিলার স্তর অনেক নীচে নেমে যায়। জলস্রোত তখন কঠিন শিলা পেরিয়ে হঠাৎ অনেক নীচে পড়ে, একে বলা হয় "জলপ্রপাত"। অনেক পাহাড়েই

ছোট বড় জলপ্রপাত দেখা যায় (চিত্র ১৯)। কিন্তু যখন বিরাট এবং প্রবল জলধারা



চিত্র ১৯। জলপ্রপাতের সৃষ্টি

সহসা অনেক নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন জলপ্রপাত এক অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। প্রপাত প্রকৃতির এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। দূরদূরান্তর থেকে মানুষ ছুটে আসে প্রপাত দেখতে। শত শত মিটার উপর থেকে বিপুল জলরাশি প্রচণ্ড বেগে নীচে পড়ছে ভয়ঙ্কর গর্জনে যুগযুগ ধরে। নীচে পড়ে প্রচন্ড কল্লোলে ভীষণ বেগে পাথর থেকে পাথরে ধেয়ে চলেছে। প্রচুর জলবুদ্বুদ জীবন্ত ঘন মেঘের মত শ্বেত ধূম্রাবরণ সৃষ্টি করছে চারিদিকে—সে এক অলৌকিক দৃশ্য। কয়েকটি বড় বড় জলপ্রপাতের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ভেনেজুয়েলার জলপ্রপাতই পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত. এর পতন হাজার ফিটেরও উপরে। পৃথিবীর এক প্রশস্ত প্রপাত হচ্ছে সুবিখ্যাত নায়গারা জলপ্রপাত, দুইভাগে মোট 4000 ফিট প্রশস্ত আর পতনের পরিমাণ 150 ফিট। এর সমতুল্য হচ্ছে মধ্য আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া প্রপাত। দক্ষিণ আমেরিকায় আরও উঁচু উঁচু জলপ্রপাত রয়েছে। গায়নার কাইতুর প্রপাত নায়গারার চেয়েও পাঁচগুণ খাড়া হয়ে পড়েছে—এর পতন-তল 822 ফিট নীচুতে। ব্রেজিলের পাওলো আফন্সো প্রপাত উত্তুঙ্গ পর্বত থেকে চারটি প্রশস্ত ধারায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে তিনশ ফিট নীচে। নায়গারার চেয়েও দেড়হাজার ফিট চওড়া ইগুয়াসু প্রপাত রয়েছে ব্রেজিলের কুরিতবা নদীপথে, দুশ ফিট এর খাড়াই। একটি আশ্চর্য সুন্দর প্রপাত হচ্ছে লা-প্লাটা নদীর গেইরু ; আঠারটি ধাপে ধাপে এই প্রপাত পর্বত থেকে নেমে আসছে। এর জলোচ্ছ্বাসে বিশ ফিট উঁচু সব ঢেউ ফণা ধরে

উঠছে। বহুদূর থেকে এর গর্জন শোনা যায়, দেখা যায় এর উৎক্ষিপ্ত জলকণার শুভ্র মেঘ। প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচ লক্ষ ঘন ফুট জল নেমে আসছে। কত অপরিসীম শক্তি রয়েছে এসব জলপ্রপাতে। আমাদের পশ্চিমঘাটের যোগ জলপ্রপাত প্রশস্ত নয় তেমন, কিন্তু 830 ফিট উঁচু থেকে পড়ছে বলে অতি মনোরম দেখায়।

সমতলভূমিতে প্রবাহের সময় নদীর স্রোত-বেগ কিছুটা কমে যায়। কিন্তু তখনও নদী পাশের তটভূমি ক্ষয় করে নিয়ে চলে, তার বিস্তারও বৃদ্ধি পেতে থাকে। গতিবেগ কম হলে বড় বড় পাথর নদীগর্ভে থিতিয়ে যায়। মাটি, সূক্ষ্ম বালুকণা ইত্যাদি স্রোতের সঙ্গে নদীর মোহনার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সুতরাং ক্ষয়-সাধনের সঙ্গে পাথর, মাটি, বালু ইত্যাদি অপসারণ করে নিয়ে আসাটাও নদীর আর এক কাজ। যতই স্রোতের বেগ মন্দীভূত হতে থাকে, নদীখাতে তত পলি সঞ্চিত হতে থাকে। অনেকদিন ধরে এরকম পলি জমে জমে নদীখাতে সমভূমি গড়ে ওঠে। আমাদের এই সুজলা-সুফলা বাংলা যে আর্যাবর্তের অংশ, লক্ষ লক্ষ বছর আগে এটা এরকম ছিল না। যুগ যুগ ধরে সিন্ধু আর গঙ্গা হিমালয় থেকে পলল বয়ে নিয়ে এসে এই উপত্যকার সমভূমি সৃজন করেছে। নদীবহুল অনেক দেশেই এরকম পাললিক সমভূমি দেখতে পাওয়া যায়।

মোহনার কাছে নদীর বিস্তার বেড়ে যায় কিন্তু স্রোতের বেগ কমে আসে। জলের ভাসমান ধূলিকণা ইত্যাদি এখানে নদীগর্ভে সঞ্চিত হতে থাকে। মোহনার কাছে নদীবাহিত শিলাচূর্ণ ও মৃত্তিকার স্তর জমে জলে নূতন স্থলভূমির সৃষ্টি হয়। স্বরচিত এই পলল স্তরের ভূমিতে বাধা পেয়ে নদীস্রোত নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়ে সাগরে উপনীত হয়। নদীমুখে পলল দিয়ে যে ভূখণ্ড তৈরী হয় সেটা ত্রিকোণাকার, তাই এর নাম ব-দ্বীপ। নদী শুধু ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় সাধন করে না। ভূখণ্ডের সৃষ্টিও করে। যে নদী বেশী পলি বয়ে আনে তাদেরই বড় বড় ব-দ্বীপ থাকে। আবার নদী যদি খুব উঁচু থেকে প্রবল বেগে সাগরে পড়ে সেখানে ব-দ্বীপ দেখা যায় না, বিশেষ করে সেখানকার সমুদ্র যদি গভীর হয়। পশ্চিমঘাটের উচ্চ কঠিন শিলার উপর থেকে আরব সাগরে নর্মদা ও তাপ্তী পড়ছে, তাই এদের ব-দ্বীপ নেই। আমাজোন, কঙ্গো এসব বড় বড় নদীর মোহনাতেও এই কারণেই ব-দ্বীপ হয় নি। পলল-জাত ভূখণ্ডের উর্বরতা খুব বেশী, প্রমাণ আমাদের সুন্দরবন। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার পলিমাটিতে তৈরী এই সুন্দরবন পৃথিবীর বিশাল ব-দ্বীপগুলির মধ্যে অন্যতম।

হাজার হাজার বছর ধরে পলি পড়তে পড়তে সমুদ্র সরে যেতে থাকে, দেশের চেহারা যায় বদলে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যাবিলন এখন পারস্য উপসাগরে থেকে 560 কিলোমিটার ভিতরে, কিন্তু এককালে এটি ছিল সমুদ্রতটে। পলি জমে জমে এখন সেখানে প্রকাণ্ড ভূখণ্ড হয়েছে। এই রকম ইটালীর আড্রিয়া একসময় আড্রিয়াটিক সাগরের তীরে ছিল; এখন পলি জমাতে বত্রিশ কিলোমিটার ভিতরে চলে গেছে। পলি জমার ফলে বড় বড় জাহাজের বন্দরে ঢুকতে বিশেষ অসুবিধা হয়, যেমন আজকের দিনে কলকাতার অবস্থা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, কত প্রচুর পলি নদী বয়ে নিয়ে আসে। একটা উদাহরণ দিই। পৌনে তিন হাজার মাইল দীর্ঘ মিসিসিপির

মোহনায় যে ব-দ্বীপের ক্ষেত্র তার আয়তন 32000 বর্গ কিলোমিটার। প্রতি বছর যে পলি স্রোতের সঙ্গে সেখানে আসে তার পরিমাণ 17000000 ঘন কিলোমিটার।

বাষ্প হয়ে চলে যাওয়ার জন্য সমুদ্র যে জল হারায় অসংখ্য নদনদী জল এনে সেই ক্ষতি পূরণ করে দেয়। বৃষ্টিপ্রধান অঞ্চলের বড় নদীগুলি থেকে বিপুল পরিমাণ জল এসে সাগরে পড়ে। আমাজোন, কঙ্গো, নীল, সেন্ট লরেন্স, এসব নদী সারাক্ষণ অপরিমেয় জলরাশি এনে সাগরে ঢালছে। আমাজোনের মোহনাতে যে খাঁড়ি তা এত প্রশস্ত যে এপার থেকে ওপার দেখা যায় না, প্রায় সমুদ্রের তুল্য। জলের সঙ্গে নদী সাগরকে দেয় যথেষ্ট শিলাচূর্ণ, খনিজ, মাটি ইত্যাদি। এদের পরিমাণও প্রচুর। কয়েকটি বড় নদীর দৈর্ঘ্য এখানে দেওয়া হচ্ছে ;

নদী	দৈর্ঘ্য (মাইল)	নদী	দৈর্ঘ্য (মাইল)
নীলনদ (আফ্রিকা)	4145	কঙ্গো (আফ্রিকা)	2718
আমাজোন (দঃ আমেরিকা)	3900	হোয়াংহো (চীন)	2700
মিসিসিপি (যুক্তরাষ্ট্র)	3760	মারে (অস্ট্রেলিয়া)	2310
ইরতিশ্ (রাশিয়া)	3200	ভোল্গা (রাশিয়া)	2290
ইয়াংসিকিয়াং (চীন)	3100	সিন্ধু (এশিয়া)	1980

নদী বিচিত্ররূপিণী। নানা বর্ণে বৈচিত্র্যে দীপ্তিতে সৌন্দর্যে নদীর যাত্রাপথ ভরপুর। গতি তার কোথাও উদ্দাম, কোথাও তার বজ্রহুঙ্কার, আবার কোথাও শুধু মৃদু কলগুঞ্জন। কোথাও নদী তট ভেঙে দিয়ে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কোথাও পলল সঞ্চিত করে ধরিত্রীকে উর্বরা করে তুলছে। নদীর রূপের কোন শেষ নেই। অমরকণ্টকের শীর্ষ থেকে এক ক্ষীণ স্রোত তরতর করে নীচে নামছে। তার সঙ্গে এসে মিশছে আরও কত জলধারা, জন্ম নিল শংকর-কন্যা নর্মদা। ক্ষিপ্রা নর্মদা অমৃত বয়ে নেমে এল পর্বত হতে, ছুটে চলল সমুদ্রের পানে। কত দেব দেউল প্রদক্ষিণ করে, কত জনপদ কলুষমুক্ত করে, কত ছোট ছোট ছায়াস্নিগ্ধ গ্রামকে আশীর্বাদ করে, কত শ্যামল বনানীকে অমৃতের পরশ দিয়ে নর্মদা ছুটে চলেছে সুদূর সাগরে আত্মাহুতি দিতে। নর্মদার কথা বলছি, কিন্তু সব স্রোতাস্বিনীই ত এমনি। আমাদের এ পুণ্যভূমি নদীমাতৃক দেশ। নদীর সঙ্গে আমাদের নিবিড় আত্মীয়তা। নদীকে দেখে দেখে আমাদের আশ মেটে না। আমরা ডাঙার উপরে থাকি, সে ডাঙা স্তব্ধ নিশ্চল, কিন্তু নদীর জল দিনরাত বয়ে যায়, তার চলার ছন্দে একটা বাণী মূর্ত হয়ে ওঠে।

দেখেছি বর্ষশেষের কালবৈশাখীর সন্ধ্যায় তীরে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের কালো যমুনাকে। উপরে নিকষ কালো সজল মেঘের সঙ্গে দুর্বার ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতি। আর নীচে পূর্ণযৌবনা যমুনা আবেগের মত্ততায় মাতঙ্গিনী উদ্দাম উল্লাসে প্রলয় বেগে লক্ষ ফণা তুলে ছুটে চলেছে মহাসাগরের বুকে বিলীন হতে। সে এক অবিস্মরণীয় ছবি।

দেখেছি, চন্দনবর্ণা উপল-উচ্ছল অলকনন্দা হরিণ-শিশুর মত নৃত্যের ছন্দে ছন্দে অপার আনন্দে ঝরঝর করে নেমে আসছে। আর হিমদুহিতা স্ফটিক-স্বচ্ছ

মন্দাকিনী চঞ্চল আবেগে এসে দিশেহারা হয়ে মিশেছে অলকনন্দায়—রুদ্রপ্রয়াগে মন্দাকিনী-অলকনন্দার সঙ্গম। নদীর এই আর এক অপরূপ ছবি।

দেখেছি, পাষাণকারা ভেঙে ভাগীরথীর প্রপাত শৈলশিখর থেকে অতল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আনন্দে-উল্লাসে। প্রচণ্ড কল্লোল তুলে নেমে আসছে পর্বতের পাদমূলে মর্তলোকের সমভূমিতে। তারপর নিবিড় অরণ্যের কান্তার পথে কিশোরীর মত আপন মনে কলস্রোতা ধেয়ে চলেছে বিভোর হয়ে। আরও দেখেছি, মোহনার কাছে এসে সেই চঞ্চলা ভাগীরথীর গতি হয়েছে শ্লথতর। মন্দাক্রান্তা গঙ্গা প্রৌঢ়া গৃহিণীর মত অঞ্চল জড়িয়ে যাচ্ছে সাগর সমীপে আত্মনিবেদনে।

রূপ আর গুণ। সমুদ্রের জল লবণাক্ত ও অপেয়, কিন্তু নদীর জল স্বাদু এবং পেয়। সুদূর অতীতে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল কঠোর। বন্য শ্বাপদের সঙ্গে সংগ্রাম করে, প্রকৃতির ফলমূল সম্বল করে তাদের যাযাবর জীবন কাটাতে হত। জলের ছিল তার একান্ত প্রয়োজন। সলিল-সন্ধানী মানুষ তাই মরু-কান্তার অতিক্রম করে এসে নদীতীরে জড় হল। নদী ইশারা দিল তাদের নতুন সরস জীবনের। ক্রমে ক্রমে যাযাবর জীবন ছেড়ে মানুষ নদীর সন্নিকট ভূমিতে বসতি করার প্রয়াস পেল, ভবিষ্যৎ সমাজের বীজ অঙ্কুরিত হল। নদীজল পিপাসার্ত মানুষকে দিল অমৃত-পানীয়, দিল অবগাহনের অনাবিল আনন্দ। ধরিত্রীকে স্নেহরসে উর্বরা করে দিল খাদ্যশস্য। মানুষ স্বর্গসুখ পেল নদীর কাছে। তাই দেশে দেশে মানুষ নদীকে বন্দনা করেছে, অর্ঘ্য দিয়েছে, দেবতা বলে পুজো করেছে—এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মানুষ শিখল নদীজলের সাহায্যে মাটির বুকে ফসল ফলাতে, শিখল ঘর বাঁধতে ; সভ্যতার পথে মানব এমনি করে এগিয়ে গেল। প্রাচীন বড় বড় সভ্যতা সবই নদীর উপকূলেই গড়ে উঠেছিল নানা দেশে। আর্যাবর্তের কৃষ্টি,,সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশও ঘটেছিল গঙ্গা-সিন্ধু-বিধৌত উপত্যকায়। নদী সভ্যতার ধাত্রীদেবতা। এই সব নদীতীরে ছিল কত প্রাচীন দেবতুল্য মুনি-ঋষির আশ্রম। সেইসব সামবেদগান-মুখরিত তপোবনে কত মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের জ্ঞানের, তপস্যার, মনীষার আলোকে মানবসমাজ বিভাসিত হয়েছিল। এইসব নদী কত জাতির উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষ্য বহন করছে, কত রাষ্ট্রের বিকাশ ও বিলয় দেখেছে। মানচিত্র খুললে দেখতে পাওয়া যায় প্রাচীনকালে সমস্ত জনপদ গড়ে উঠেছিল কোন না কোন নদীর উপকূলে। আজও ত অন্তর্দেশীয় প্রধান জনপদগুলি নদীতীরেই।

অতিবর্ষণ হলে বা প্রখর সূর্যতাপে যদি খুব বেশী হিমবাহ গলে যায় তবে প্রচুর জল নদীতে নেমে আসে। নদীতে হঠাৎ জলের স্ফীতি দেখা দেয়। নদীজল তখন দুকূল ছাপিয়ে ভূভাগকে প্লাবিত করে দেয়—এরই নাম বন্যা। পলি জমে যদি নদীর তলদেশ উঁচু হয়ে ওঠে, তবে এই প্লাবন খুবই সহজে এবং বিরাট আকারে আসে। বন্যায় স্রোতের বেগ খুব তীব্র হয়, সেইজন্য ক্ষতিসাধনও খুব বেশী হয়।

প্লাবন যেখান দিয়ে যায় সেখানকার ঘরবাড়ী, শস্যক্ষেত্র, গাছপালা সবকিছু ধ্বংস করে, নিশ্চিহ্ন করে যায়। বন্যায় নদীর রূপ ভয়ঙ্কর। বরাভয়া বিগলিত-করুণা ছন্দোময়ী স্নিগ্ধ তটিনী তখন দুর্বার বেগবতী প্রলয়ঙ্করী করালীর মূর্তি ধারণ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যতম এই বন্যা। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ভয়াবহ, মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা তো আছেই, তাছাড়া সারাদেশের এক সর্বনাশ ডেকে আনে বন্যা, তার পায়ে পায়ে এসে উপস্থিত হয় দুর্ভিক্ষ আর মহামারী। অনেক সময়েই বন্যা নেমে আসে হঠাৎ, তাই ক্ষতিটা হয় প্রচণ্ড রকমের।

বন্যার দুঃখের ইতিহাস রয়েছে সবদেশেই—চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, মিশর আরও নানাদেশের বন্যার মর্মন্তুদ কাহিনীতে সেই ইতিহাস ভরা। বন্যার সঙ্গে মানুষ যুদ্ধ আরম্ভ করেছে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই। কিন্তু আজও পর্যন্ত তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে উঠতে পারেনি। আজ থেকে চার হাজার বছরেরও আগে চীন-সম্রাট ইউ (*Yü*) ইয়াংসি-নদীর তলদেশ কেটে গভীরতর করে মাঝে মাঝে পরিখা তৈরী করে বন্যার স্রোত নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। বর্তমানের উন্নত বিজ্ঞানের যুগেও যেসকল পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে তার মধ্যেও সেই পুরাতন নীতি অন্যতম। বন্যার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

(১) নদীর উপরের দিকেই উপযুক্ত জায়গায় আড়াআড়ি ভাবে উঁচু অবরোধ তৈরী করে জল আটকিয়ে রেখে নদীর জলপ্রবাহ সীমিত করা হয়। এগুলো হচ্ছে বাঁধ বা ড্যাম (dams)। অবরোধগুলো মজবুত হতে হবে, তাই প্রায়ই সিমেণ্ট-কংক্রীট দিয়ে তৈরী। বাঁধের উপরের দিকে তখন বিরাট জলাধার তৈরী হয়, অর্থাৎ হ্রদের সৃষ্টি হয়। প্রয়োজন মত জল ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত রাখা হয়। আমাদের দেশের ভাক্‌রা-নাঙ্গাল, তিলাইয়া প্রভৃতি ড্যাম এই রকমের। আমেরিকার কোলোরাডো নদীর উপরের বোল্‌ডার ড্যাম, মিশরের নীলনদের উপরের আসোয়ান ড্যাম প্রভৃতি এই ধরনের। জল আটকিয়ে ড্যামের উপরের দিকে যে কৃত্রিম হ্রদ হয় সেগুলোও অনেক সময় বিশাল আকারের ; দৃষ্টান্ত আসোয়ান বাঁধের নাসের হ্রদ, ওয়েন ফলস্‌ ড্যামের ভিক্টোরিয়া হ্রদ। সাইবেরিয়ার ব্রাটস্ক (Bratsk dam) ড্যামের হ্রদ 517800 হেক্টার।

বাঁধ ছাড়াও অপেক্ষাকৃত কম উঁচু ব্যারাজ তৈরী করে এবং তার নীচের দিকে জলকপাট (lock gate) রেখেও জলস্রোত নিয়ন্ত্রিত করা হয়। আমাদের খুব কাছেই এরকম একটি ব্যারাজ আছে। সিউড়ির তিলপাড়া-ব্যারাজ। নদীর বাঁকের কাছে আড়াআড়ি করে পাথর ফেলে বা খুঁটি পুঁতে খানিকটা অবরোধ সৃষ্টি করে জলস্রোত মন্দীভূত করাও প্রয়োজন হয়, বিশেষতঃ যেখানে পাড় ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এগুলোকে বলে উইয়ার (weir)।

(২) নদীর যেখানে ব্যারাজ দেওয়া হয়, তারও উপর থেকে ক্যানাল বা খাল কেটে

জলের কতকাংশ প্রবাহিত করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই খালগুলো প্রায়ই দূর দূরান্তর ঘুরে আবার নদীর নিম্নভাগে কোথাও এসে মিলিত হয়। এভাবে জল অপসারিত হওয়ায় বন্যার সম্ভাব্যতা কিছু হ্রাস পায়, দেশের আর্থিক উন্নয়নের দিক থেকে এই খালগুলোর মূল্য যথেষ্ট, সে কথায় পরে আসছি।

(৩) নদীকূলের সমভূমি যদি নীচু হয় তবে মাটি আর পাথর দিয়ে উঁচু বাঁধ তৈরী করে দেওয়া হয়, যাতে সমভূমির শস্যক্ষেত্র ও বাড়ীঘর প্লাবিত না হয়। এ পদ্ধতি বহুকাল থেকেই নানাদেশে প্রচলিত। আমাদের দেশেও অনেক নদীর তীরেই এরকম বাঁধ রয়েছে।

(৪) নদীর তলদেশ থেকে ড্রেজার দিয়ে পলিস্তর নিয়মিত অপসারণ করে নদীর গভীরতা যতটা সম্ভব বেশী রাখার চেষ্টা করা হয়।

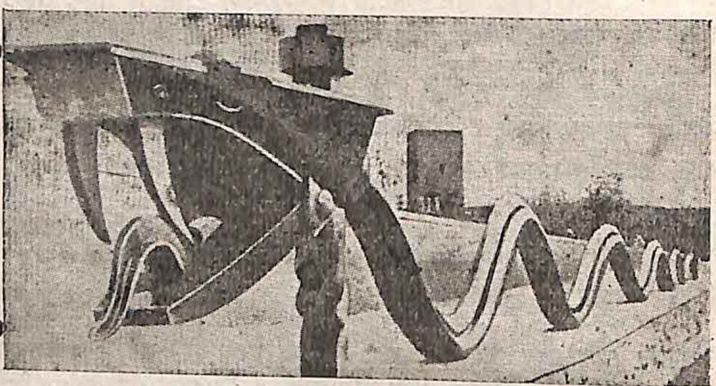
(৫) বন্যা প্রতিরোধে সাহায্য করার জন্য ভূমিক্ষয় রোধ করা এবং জল শোষণ করার জন্য মাটির শক্তি বাড়ানো প্রয়োজন। এজন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্দিষ্ট অঞ্চলে বনভূমি সৃষ্টি করা ও রক্ষা করা দরকার। অনেক সময় বনাঞ্চল নিশ্চিহ্ন করে জমিতে শস্য আবাদ করা হয়। বৃষ্টিতে সেই সব অঞ্চলের জমি ধুয়ে চলে আসে। পরে শুধু যে জমির উর্বরতা লোপ পায় তাই নয়, বৃষ্টিপাত কমে, বৃষ্টিপাতের জলকে জমি আর ধরে রাখতে পারে না। বনরক্ষণ ব্যবস্থার দিকে আজকাল সবদেশেই দৃষ্টি দেওয়ার এটি একটি বড় হেতু।

এত সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও বন্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় নি। এ শতাব্দীর সব চেয়ে বড় বন্যা হয়েছিল 1931-এ চীনদেশে ইয়াংসি নদীতে। প্রচুর বৃষ্টিপাতে ইয়াংসির দুকূলের হাজার হাজার বর্গ কিলোমিটার জনবহুল অঞ্চল নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। পনেরো মিটার উঁচু জলস্রোতের প্লাবনে সমস্ত বাড়ীঘর, শস্যভান্ডার, সব কিছু একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মোটামুটি হিসেবে দেড় লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছিল আর অন্ততঃ আড়াই কোটি লোক সর্বহারা হয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল। দুর্ভিক্ষের অনাহারে আরও কত প্রাণ গিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। এক একটি বড় বন্যাতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, বড় বড় মহাযুদ্ধেও সেরূপ হয় না। ধ্বংসের এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি আর কদাচিৎ দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপিতে আর জার্মানীর রাইন নদীতে প্রায়ই বন্যা দেখা দিত। বহু বাঁধ আর ব্যারাজ ও খাল দিয়ে এদের এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। রাইন নদীতীরের ডুসেলডর্ফ সহরের অনেকবারই বন্যায় খুব ক্ষতি হয়েছে। বাঁধ দিয়ে রাইনকে সংযত করার পর, ডুসেলডর্ফের বাঁধের উপর প্রতীক হিসাবে লোহার তৈরী একটি বিরাট অজগরকে (চিত্র ২০) শলাকাবিদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ অজগর-বন্যাকে মানুষের কাছে পরাস্ত হয়ে বন্দী হতে হয়েছে।

অনেক সময় আচমকা প্রবল বর্ষণ থেকে বন্যা এসে উপস্থিত হয়। মানুষের

নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার কোন সুযোগ থাকে না। 1937-এ এরকম এক প্রবল বন্যা এসেছিল দক্ষিণ সিরিয়াতে। নিমেষের মধ্যে প্রবল স্রোতে গ্রামের পর গ্রাম ভেসে



চিত্র ২০। ডুসেলডর্ফে রাইন নদীর বন্যা-নিরোধ প্রতীক

গিয়েছিল। অসংখ্য মৃতদেহ, প্রকাণ্ড সব শিলাখণ্ড নিয়ে স্রোত দুর্বার গতিতে ছুটেছিল। এক ভদ্রলোক বার মাইল দূরে এক বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলেন এবং সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরে এসেছিলেন। পরদিন ভোরে উঠে তিনি সেই বন্ধুর মৃতদেহ তাঁর উঠোনেই ভাসছে দেখতে পান। 1969-এ রাত দুপুরে হঠাৎ ঘুমন্ত জলপাইগুড়িতে যে প্রবল বন্যা নেমে এসেছিল, তাতে বহু প্রাণ বিনষ্ট হয়েছিল স্বল্পক্ষণের মধ্যে। এ স্মৃতি বাংলার অনেকেরই নিশ্চয় মনে আছে। আমাদের দেশের দামোদর, কুশী, ত্রিস্রোতা (তিস্তা) এসব নদীতে প্রায়ই বন্যা দেখা দেয়, ক্ষয়ক্ষতিও হয় প্রচুর।

ড্যামের জলাধার শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নয়, আরও অনেক মানব-কল্যাণকর কাজে এই জলাধার ব্যবহৃত হয়। জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে খাদ্যশস্যের ফলন বাড়ান প্রয়োজন হয়েছে, প্রকৃতির ফলন যথেষ্ট নয়। এইজন্য জমির উর্বরতা কৃত্রিম সার দিয়ে বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু সারের সঙ্গে চাই উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে জল। নদীর উপকূলভাগে সহজেই জল পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু শীতকালে রবিশস্যের সময় অনেক নদীতে জল প্রায় থাকে না, তখন চাষ-আবাদ কঠিন হয়। আবার নদী থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে, বিশেষতঃ যেখানে বৃষ্টিপাত কম সেখানে জলের অভাবে শস্যের ফলন হওয়া মুস্কিল। কোনও শস্যেরই একটা নিম্নতম পরিমাণ জল না হলে ফলন হয় না। এই জলের চাহিদা একর-ইঞ্চিতে পরিমাপ করা হয়। যেমন, ধানের জন্য মোটামুটি 42" ইঞ্চি, গমের জন্য, 15" ইঞ্চি, আলুর জন্য 28" ইত্যাদি জল লাগে। আবার গাছের সব সময় একই পরিমাণ জল প্রয়োজন হয় না। প্রথমে চারাগাছ পুঁতবার সময় যথেষ্ট জল লাগে, আবার যখন ফুল ধরে বা ফল পুষ্ট হয় তখন বেশী জল প্রয়োজন। আজকাল বাঁধ, ব্যারেজ ইত্যাদি থেকে প্রশস্ত সব খাল কেটে ইচ্ছামত জল নিয়ে যাওয়া যায়। এই সব খালের শাখা প্রশাখা অনেক মাইল দূরে গিয়েও আবাদী জমিতে প্রয়োজন মত জল

পৌঁছে দেয়। তাই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় বাঁধের জল এবং ক্যানেলের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বাঁধে জল ধরে রাখা যায় বলেই ফসল বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, দাক্ষিণাত্যের ক্যানেলশ্রেণী লক্ষ লক্ষ একর জমির চাষ-আবাদে সাহায্য করছে। পশ্চিমবঙ্গেও বেশ কিছু সেচের কাজ এখন খালের জল থেকে হচ্ছে।

বাঁধের জলের আর একটি কাজ হচ্ছে তড়িৎ-উৎপাদন। উঁচু থেকে বাঁধের জল যখন বেগে নীচে নেমে আসে তখন সেটাতে গতীয় শক্তি থাকে প্রচুর। এই স্রোতের পথে টারবাইন-যন্ত্র বসান হয়। স্রোতে এই টারবাইন ঘুরতে থাকে এবং তা থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যায়। অর্থাৎ জলস্রোতের গতীয় শক্তির খানিকটা বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত হয়। এখানে বিদ্যুৎ পাবার জন্য আর কয়লা পুড়িয়ে ডায়নামো চালানো দরকার হয় না ; সেজন্য খরচ পড়ে কম। দাক্ষিণাত্যে সস্তায় এই বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হয়েছে—উত্তর ভারতেও অনেক যায়গায় এই রকম জল বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। বড় বড় কলকারখানা এই বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে। গ্রামে গ্রামেও এই বিদ্যুৎ পাঠান সম্ভব হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র ব্যবহার করে, চাষ-আবাদ ও শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা হচ্ছে।

আমরা শুধু বসে থাকব, আমাদের যা কিছু প্রয়োজন, খাদ্য, সামগ্রিক ভাণ্ডার, আয়াসের ব্যবস্থা সব আপনা থেকে হাজির হবে, আর আমরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করে পরম আরামে থাকব, এটা প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ। পরিশ্রম করে প্রকৃতির কাছ থেকে আমাদের আদায় করতে হবে সব কিছু। শস্য ফলাতে হবে, সম্পদ আহরণ করতে হবে, প্রয়োজনের সামগ্রী তৈরী করতে হ'বে—এমনি এমনিই সব হবে না। তাই মনীষী বলেছেন, "To eat bread in the sweat of his brow is the original punishment of mankind"। মানুষকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়, বাঁধ তৈরী করতে হয়, খাল কেটে ক্ষেতে জল নিয়ে যেতে হয়, টারবাইন বসিয়ে বিদ্যুৎ জোগাড় করতে হয়।

খালের জল আর একটি ব্যাপারে সাহায্য করে। নদীতে সব সময় যথেষ্ট জল থাকে না, তাই নাব্যতা কমে যায়। কিন্তু বড় বড় ক্যানাল জলপথ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। খালের জলের গভীরতা এমনভাবে রাখা সম্ভব যাতে বড় বড় নৌকা সহজে চলাচল করতে পারে। জলপথে মাল সরবরাহের খরচ অনেক কম, সুতরাং ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে এটা বিশেষ কাম্য। এও সম্ভব হয়, যদি যথেষ্ট পরিমাণ নদীজল বাঁধে আটকে রাখা যায়।

ধরিত্রীর নদীগুলো যে জল সাগরে বয়ে নিয়ে আসে তার আয়তনের পরিমাণ প্রায় 39000 ঘন কিলোমিটার (km^3)। এর বেশীর ভাগটাই আসে এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। নদী ছাড়াও আনটার্কটিকা এবং গ্রীনল্যান্ডের হিমবাহ গলে প্রায়

3000 ঘন কিলোমিটার জল সাগরে যায়। মোটামুটি একটা গড় হিসাব ঃ

নদী থেকে সমুদ্রে বার্ষিক জল বহনের পরিমাণ

উৎস	পরিমাণ ঘন কিলোমিটার (km^3)	শতাংশ
এশিয়া	13190	~ 32
দঃ আমেরিকা	10380	25
উঃ আমেরিকা	5960	14
আফ্রিকা	4225	10
ইউরোপ	3110	7.3
অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি	1965	4.7.
আনটার্কটিকা	2200	7.0
গ্রীনল্যান্ড	700	
মোট ঃ	41730	100%

গত পাঁচ ছয় দশকের নানারকম পরিমাপ থেকে এই হিসাবটি তৈরী হয়েছে। নদীর জলের পরিবহণ ভৌগোলিক পরিবেশ, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। বছরের বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন পরিমাণ জল নদী থেকে সাগরে উৎসারিত হয়। আবার, অনেক সময়েই একই নদীর জল-পরিবহন সর্বদা এক হয় না। তবে সমস্ত নদীর একত্রে পরিবহণের গড় পরিমাণ মোটামুটি স্থির থাকে।

নদী স্রোতের সঙ্গে মাটি, বালুকণা এবং অন্যান্য নানা অদ্রব পদার্থ ও আবর্জনা এসে সমুদ্রে পড়ে আর সেখানে থিতিয়ে যায়। খুব সূক্ষ্মকণাগুলো কলয়ডীয় অবস্থায় থাকে এবং তার অধিকাংশই নোনাজলের সংস্পর্শে এসে আকারে বড় হ'য়ে পলিতে স্থান পায়। নদীতে এভাবে বছরে প্রায় দুশ কোটি টন অদ্রব পদার্থ পলিতে জমে।

এছাড়া প্রচুর দ্রবিত পদার্থও জলের সঙ্গে সাগরে আসে। এদের মধ্যে আছে জৈব পদার্থ, নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ঘটিত পদার্থ, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর লবণ, ইত্যাদি। এইগুলো সমুদ্রের জীব জগতের পুষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজন। পরিবাহিত জৈবপদার্থের পরিমাণ বছরে অন্যূন চল্লিশ কোটি টন আর এর প্রায় পাঁচ গুণ অর্থাৎ দু'শ কোটি টন দ্রবিত অজৈব বস্তু। অর্থাৎ, স্থলভাগ থেকে অন্ততঃ চারশ' কোটি টন পদার্থ বছরে সাগরে চলে যায়। এর দশ শতাংশই আসে মাত্র দুইটি নদী আমাজোন আর কঙ্গো থেকে। পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগের বর্গায়তন ধরলে এই ক্ষয়ের ফলে তার পৃষ্ঠ দেশ এক শতাব্দীতে প্রায় এক সেন্টিমিটার নীচু হচ্ছে। এই ক্ষয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়ছে। তার একটা কারণ বনজঙ্গল কেটে জমিকে শস্যক্ষেত্রে পরিণত করা। এতে মাটির দৃঢ় বাঁধনটা আল্‌গা হয়ে পড়ে। বৃষ্টির জলে খানিকটা জমি ধুয়ে চলে যায়। বাস্তব্য-ব্যবস্থার (ecosystem) এই পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থী এবং শেষ পর্যন্ত বন কেটে আবাদ ক্ষতিই করবে।

যেসব বিভিন্ন পদার্থ সমুদ্রে পরিবাহিত হয়, তারও একটা হিসাব করা হয়েছে। কার্বনেট, সালফেট এবং সিলিকেট জাতীয় পদার্থই সর্বাধিক। তা ছাড়া যথেষ্ট ক্যালসিয়াম এবং সোডিয়াম ঘটিত পদার্থ সমুদ্রে যাচ্ছে। বছরে সমুদ্রে যাচ্ছে ঃ *

অদ্রব পদার্থ—200 কোটি টন, আর

দ্রবিত পদার্থ ঃ	কোটি টন		কোটি টন
জৈবপদার্থ	40.4	কার্বনেট (CO_3)	140.0
ক্যালসিয়াম	81.6	সালফেট (SO_4)	48.6
ম্যাগনেসিয়াম	13.7	সিলিকেট (SiO_2)	46.8
সোডিয়াম	23.0	ক্লোরাইড (Cl)	22.7
পটাসিয়াম	8.5	নাইট্রেট (NO_3)	3.6
আয়রন-অ্যালুমিনা অক্সাইড	11.0	ফসফেট (PO_4)	0.9

জীবজগতের অস্তিত্বের মূলে যে প্রাণবস্তু প্রোটোপ্লাজম রয়েছে, তার 95 শতাংশ পাঁচটি মৌল দিয়ে তৈরী—অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন ও ফসফরাস। এরা নানা যৌগরূপে সাগরে চলে যাচ্ছে। অক্সিজেন (বাতাসে) এবং হাইড্রোজেন (জলে)—এই দুইটির অক্ষয় ভাণ্ডার রয়েছে। কার্বন ও হাইড্রোজেন সমুদ্রে চলে গেলেও প্রকৃতির চক্রীয় পরিক্রমায় আবার সেগুলো কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অ্যামোনিয়া হিসাবে ফিরে পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্যাটা ফসফরাস নিয়ে। বছরে 35 লাখ টন ফসফরাস সমুদ্রে চলে যায় আর ফিরে আসে না। শুধু গোয়ানো হিসাবে সামান্য ফসফরাস সমুদ্র থেকে পাই। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পুষ্টির জন্য ফসফরাস অপরিহার্য। যদি অনেক হাজার বছরের পরে প্রাণবস্তুর উৎপাদনের সমস্যা দেখা দেয়, সেটা হবে ফসফরাসের অভাবের জন্য।

নদীর দূষণ

নদীর জল সম্পর্কে আর একটি বিষয় বলা দরকার। সেটা হল নদীজলের দূষণ। শস্য-উৎপাদনের জন্য জল চাই, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য জল চাই। এই প্রয়োজনে অতীত কালের মানুষ নদীর তীরে এসে বসবাস শুরু করেছিল। ক্রমে নদীর ধারে ধারে সেকালে সব নগর পত্তন হয়েছিল। আর সেখানেই প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু-সভ্যতার পত্তন হয়েছিল যেমন সিন্ধুতীরে, তেমনি গাঙ্গেয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল গঙ্গা-যমুনার তীরে তীরে। মহেঞ্জোদারো, হস্তিনাপুর, কান্যকুব্জ, বারাণসী, পাটলিপুত্র, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী—সবই ছিল নদীতীরে। অন্যদেশের একই ইতিহাস। টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের তীরে সুমেরীয় সভ্যতা, হুয়াং-হোর তীরে

* Sc. Am. Vol 198. P 83, 1958 (Ecosphere)

চীনসভ্যতা, নীলনদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা জন্ম নিয়েছিল। আজ-ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে নদীর দান অনস্বীকার্য।

আধুনিক সভ্যতার গোড়ায় রয়েছে শিল্পবিপ্লব। জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং তাদের অফুরন্ত প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে তৈরী হল অসংখ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান আর শিল্প-নগরী। পাট, তেল, বস্ত্র, ওষুধ, রাসায়নিক, কাগজ, চিনি,...সব শিল্পেই প্রচুর জলের প্রয়োজন আর তাই নদীর সান্নিধ্য চাই। শুধু প্রয়োজনের জল পাবার সুবিধা নয়, শিল্পে উদ্ভূত আবর্জনাকে অনায়াসে ভাসিয়ে দেওয়ার সুবিধার জন্যও সন্নিকটে নদীর জলপ্রবাহ কাম্য। তাই আজও বড় বড় কলকারখানা নদীর ধারেই বেশী, বিশেষ করে যদি সেটা মোহনার কাছে হয় তাহলে সর্বোত্তম।

দেখা যাচ্ছে বর্তমান কালে বিশেষ করে গত তিন-চার দশকে উন্নতদেশগুলিতে এবং ভারতের মত উন্নতিকামী দেশগুলিতে নদীর জল ভয়াবহরকমে দূষিত হয়ে উঠেছে। নদীদূষণের কয়েকটি প্রধান কারণ ঃ

(i) কলকারখানার বর্জ্য পদার্থগুলি প্রায় সব ক্ষেত্রেই সরাসরি পার্শ্ববর্তী নদীতে ফেলা। যে ধোয়ানী বা আবর্জনা নদীতে নিষ্কাশন করা হয় সেটা সবক্ষেত্রেই কম বেশী বিষাক্ত। আইনগত বাধ্যতা সত্ত্বেও এই বিষাক্ত, পদার্থগুলিকে পৃথক করে নষ্ট করে ফেলার ব্যবস্থা কোথাও প্রায় থাকে না। এই কলকাতাতেই অবস্থিত 440 টি চটকল থেকে যে কলুষ গঙ্গাতে গিয়ে মেশে প্রতিদিন, সেটা অপরিমেয়। তাছাড়াও আরও অনেক শিল্পসংস্থা সেখানে রয়েছে। আর একটি দৃষ্টান্ত দিই।

আসানসোল-দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলে অনেকগুলি কলকারখানা রয়েছে। এইসব কারখানা থেকে যে বিষাক্ত আবর্জনা নিষ্কাশিত হয় সেটা পরীক্ষা করা হয়েছে।[১] দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা থেকে নির্গত হয় লোহা, তেল গ্রীজ, অ্যাসিড, আর কয়লার গুড়ো। দুর্গাপুর প্রজেকট ও রসায়ন কারখানা থেকে আসে অ্যামোনিয়া, ফেনল, সায়ানাইড ও থায়োসায়ানেট, জৈব-অ্যাসিড, ক্লোরিন, সীসা, ইত্যাদি ; দুর্গাপুর সারখানা থেকে অ্যামোনিয়া, ক্রোমিয়াম ঘটিত পদার্থ, রাণীগঞ্জ কাগজের কল থেকে বের হয় লিগনিন, কষ্টিক ক্ষার, সালফার ঘটিত যৌগ, চুণ ইত্যাদি। এই সবই বিভিন্ন নালার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত দামোদরের বুকে আশ্রয় নেয়। আর সেই দামোদরের জল ব্যবহার হয় সেচ ও কৃষিকাজে ; সেখান থেকে বিষ ছড়িয়ে পড়ে জীবজগতে।

(ii) সহরের জনসংখ্যা বিপুল। নগরের আবর্জনা, মলমূত্র ইত্যাদি বিভিন্ন পয়ঃ প্রণালী দিয়ে এসে নদীতে পড়ে। বৃহত্তর কলকাতায় শত শত টন বর্জ্য কলুষ প্রতিদিন 137 টি নর্দমা ও নালা দিয়ে এসে গঙ্গায় স্থান পাচ্ছে। দিল্লী সহরের বিশ কোটি লিটার বিষাক্ত তরল আবর্জনা প্রত্যহ এসে যমুনায় পড়ছে। এই ময়লার সঙ্গে সর্বদাই নানাধরনের রোগ জীবাণু রয়েছে। অনেক সংক্রামক ব্যাধি এই নদীজলের মাধ্যমেই ছড়ায়। অনেকের একটা অন্ধ বিশ্বাস আছে গঙ্গার জল অপবিত্র হয় না।

(১) জ্ঞান ও বিজ্ঞান ; 35 তম খণ্ড, 6 সংখ্যা

একটা সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, গঙ্গা পৃথিবীর ভয়াবহভাবে দূষিত নদীগুলির অন্যতম।[২]

অধিকাংশ সাধু-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস শবদেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে তার সদ্গতি ও পুণ্যলাভ হয়। এই কারণে শত শত সাধুর মৃতদেহ বছরে গঙ্গাতে ভাসান হয়। এ ছাড়া নদীতীরবর্তী গ্রাম ও সহরের মৃত জীবজন্তুকে নদীতে ফেলা হয়। অপ্রয়োজনীয় এবং বর্জ্য বস্তুকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া আমাদের দীর্ঘ কালের অভ্যাস, এ সবও নদীজলকে অনেকখানি কলুষিত করে।

(iii) নদী দূষণের আর একটি সাম্প্রতিক কারণ নদীতীরের চাষের জমিতে প্রচুর কীটনাশক ওষুধের অবাধ ব্যবহার। এই কীটনাশক দ্রব্যগুলি সবই তীব্র বিষ। অনেক সময়েই সেচের জলে বা বৃষ্টির জলে পরিবাহিত হয়ে এই সব পদার্থ নদীতে এসে পড়ে। জলের সঙ্গে মিশে এই সব বিষ অল্পাধিক জীবজগতে প্রবেশ করে এবং নানা অনর্থের সৃষ্টি করে। এখন মনে করা হচ্ছে বহুল ব্যবহৃত D. D. T. কীটনাশক যকৃতের পীড়া এমনকি কর্কট-রোগ ঘটাতে সক্ষম।

প্রাণী-এবং উদ্ভিদজগতের উপর নদীজলের দূষণের পরিণাম মারাত্মক। দূষিত জলের জন্য মাছের ডিম থেকে বাচ্চা হয় না। চারা-মাছ বা ডিম নষ্ট হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে মাছের বিকৃতি ঘটে, স্বাদ তো নষ্ট হয়-ই। আজকাল গঙ্গার মোহনায় আগের মত ইলিশের প্রাচুর্য নেই। তার প্রধান কারণ, আগে সমুদ্র থেকে ইলিশ নদীর মিষ্টি জলে আসত ডিম পাড়তে। এখন জলের অতিরিক্ত কলুষের জন্য সে সব মাছ আর আসে না।

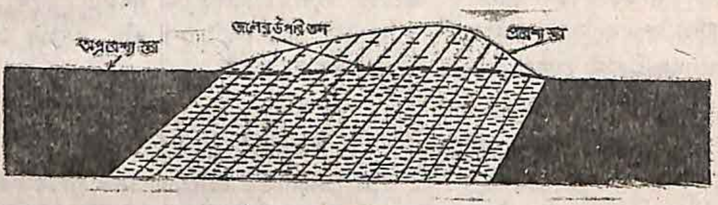
অনেকক্ষেত্রেই দৈনন্দিন গৃহকাজে বা পান করার জন্য নদীজল ব্যবহার করতে হয়। জলের কলুষ তাই সহজেই মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে এবং নানা ব্যাধির সৃষ্টি করে। কৃষিতে কলুষিত জল ব্যবহারের জন্য কৃষকের স্বাস্থ্যহানি এবং জমিদূষণ দুই-ই ঘটে। মাটির চরিত্রও ধীরে ধীরে বদলে যায়; ফলনের ক্ষতি হয়। জলজ উদ্ভিদে নদীর জলের বিষ সহজেই শোষিত হয়। যে সব পশুকে ঐ জলজ-উদ্ভিদ খাদ্যরূপে দেওয়া হয় তারাও আক্রান্ত হয় এবং তার মাধ্যমে নদীদূষণের প্রভাব এসে পড়ে মানুষের ওপরে। এই সকল দূষণের প্রতিকার যে একান্তভাবে প্রয়োজন এবিষয়ে বিভিন্ন দেশের মানুষের মনে এখন সচেতনতা এসেছে, এটা সুলক্ষণ।

৬। মাটির নীচে জল

পৃথিবীর ভূভাগের উপরে যে বৃষ্টিপাত হয়, সেই জলের বেশীর ভাগই নদী, নালা, পুকুরে গাড়িয়ে যায়; খানিকটা অবশ্য বাষ্পীভূত হয়ে উড়েও যায়। বাকীটা মাটির ভিতরে প্রবেশ করে। ভূস্তরে দুই রকমের শিলা রয়েছে। একরকম শিলার ভিতর দিয়ে জল অনায়াসে চলে যেতে পারে, এগুলোকে বলে "প্রবেশ্য" (permeable)

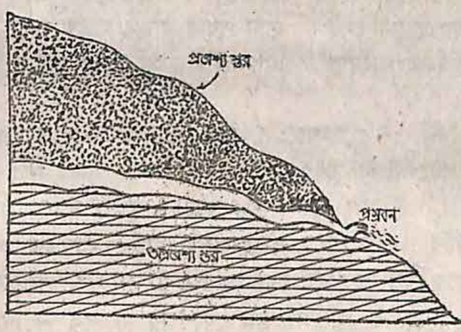
(২) সভাপতির ভাষণ : বিজ্ঞান-কংগ্রেস, 1981

শিলাস্তর আর দ্বিতীয় রকমের শিলাতে জল ঢুকতে পারে না, এগ্‌লি "অপ্রবেশ্য" শিলাস্তর। প্রবেশ্য স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে জল শেষপর্যন্ত নীচে এক অপ্রবেশ্য স্তরে পৌঁছয়। তখন আর না যেতে পেরে জল সেখানে জমতে শুরু করে। এমনি করে ভূগর্ভস্থ জল সঞ্চিত হয় (চিত্র ২১)। সেখানে যত বেশী জমে, সঞ্চিত জলের



চিত্র ২১। ভূগর্ভস্থ জল সঞ্চয়

উপরি-তল (water table) তত উচ্চ হতে থাকে। এমনি করে জল অপ্রবেশ্য স্তরের উপর জমে আর যখন নীচে যাবার পথ পায় না তখন উপরের দিকে বাইরে আসার পথ পেলে সেখান দিয়ে সবেগে বেরিয়ে আসে। ভূগর্ভ থেকে জলের এই স্বতঃ উৎসারণকে বলে "প্রস্রবণ" (চিত্র ২২)। অনেক প্রস্রবণ আছে যেখানে শত শত বছর ধরে



চিত্র ২২। প্রস্রবণ

প্রস্রবণের ধারা নিয়ত উৎসারিত হয়ে আসছে। কাশ্মীরের পাহাড়ের গায়ের মনোরম উদ্যানগুলিতে রয়েছে এই রকমের বড় বড় অবিরাম প্রস্রবণ। ঐ জলধারা কেন্দ্র করেই মোগল বাদশাহেরা ঐসব অপূর্ব উদ্যান গড়ে তুলেছিলেন।

অপ্রবেশ্য শিলাস্তর মাটির নীচে যদি হেলান থেকে তবে নির্গম পথ দিয়ে প্রস্রবণের ধারা খানিকটা বেরিয়ে গেলে জলের উপরিতল নির্গমমুখের নীচে চলে যায় এবং প্রস্রবণের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। আবার জল সঞ্চিত হলে তখন প্রস্রবণের উৎসারণ দেখা দেয়। এরা "সবিরাম প্রস্রবণ"; কোন কোন জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এরকম প্রস্রবণ দেখা যায়। শিলাস্তরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় জল নানারকম লবণ খনিজপদার্থ ইত্যাদি দ্রবিত করে নেয়। সেই জন্য প্রস্রবণের জলে প্রায়ই নানা ধাতব পদার্থ থাকে। খুব বেশী পরিমাণে এসব পদার্থ থাকলে, এদের বলা হয় "খনিজ

প্রস্রবণ”। ইংলন্ডের বাথে, ইউরোপের কার্লসবাদে, এরকম খনিজ প্রস্রবণ রয়েছে। কোন কোন রোগ উপশমের জন্যও এরূপ খনিজ প্রস্রবণ-জল ব্যবহার হয়।

মাটির অনেক নীচে জল চলে গেলে বা আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে মাটির তলে জল সঞ্চিত হলে, সেই জল খুব গরম হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে প্রস্রবণের ধারা খুব উত্তপ্ত থাকে; এদের “উষ্ণ প্রস্রবণ” বলে। বীরভূমের বক্রেশ্বরে, বিহারের রাজগীরে, বাংলাদেশের চন্দ্রনাথে, মুঙ্গেরের সীতাকুন্ডে, হিমালয়ের বদরীনারায়ণে এরকম সব উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। নীচে তাপমাত্রা যদি খুবই বেশী হয় তবে উত্তপ্ত জল উপরে উঠে আসার সময় খানিকটা বাষ্প হয়ে বের হয়। সেই বাষ্প উষ্ণ জল নিয়ে প্রস্রবণের মুখ দিয়ে উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। এরকম বাষ্প-মিশ্রিত প্রস্রবণকে বলে, “গীজার” (geyser)। আইসল্যান্ডে, নিউজিল্যান্ডে অনেক গীজার দেখা যায়। আমেরিকার ইয়োলো-স্টোন পার্কে ওল্ড ফেথফুল (Old Faithful) নামে এক প্রসিদ্ধ গীজার আছে ; একঘন্টা পরপর অত্যুষ্ণ জল ও বাষ্প সেখান থেকে প্রায় ত্রিশ মিটার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে থাকে।

ভূগর্ভস্থ জল আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। নদীনালা যেখানে কম, বা শীতের সময় যখন নদীনালা শুকিয়ে যায় তখন জল পাওয়ার জন্য কূপ বা নলকূপের উপর নির্ভর করতে হয়। দৈনন্দিন প্রয়োজনে ত বটেই, কৃষিকাজেও নলকূপের জল ব্যবহার হয়। আজকাল এ রাজ্যে বহু অগভীর নলকূপ বসিয়ে সেচের জল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। উন্মুক্ত কূপগুলি সাধারণতঃ আর্টেজীয় কূপ (Artesian well)। এটাকে একরকম কৃত্রিম প্রস্রবণ বলা যেতে পারে। দুটো অপ্রবেশ্য স্তরের মধ্যে চাঁদের ফালির মত বাঁকানো যদি একটা প্রবেশ্য স্তর থাকে, আর এই প্রবেশ্য স্তরের প্রান্তভাগ যদি দূরে কোথাও ভূপৃষ্ঠে উন্মুক্ত থাকে, তবে দুই অপ্রবেশ্য স্তরের মধ্যে জল জমে (চিত্র ২৩)। জলের উপরিতল ক্রমশ উচুঁ হতে থাকে। এখন উপরের অপ্রবেশ্য স্তরের মধ্য দিয়ে 'w' চিহ্নিত অংশে কুয়ো খুঁড়লে নীচের জল উপরিতলের লেভেলে আসবেই। এটাই আর্টেজীয় কূপ। এই জল তখন সংগ্রহ করে (প্রয়োজন হলে পাম্প বসিয়ে) ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ২৩। আর্টেজীয় কূপ

ভূগর্ভে সঞ্চিত সলিল-সম্পদের একটা পরিমাণ রুশবিজ্ঞানী মাকারেনকো করেছেন। তাঁর হিসাব মতো মাটির নীচে 60,000000 ঘন কিলোমিটার জল আছে। এর মধ্যে মাত্র 4,000000 ঘন কিলোমিটার আছে ভূপৃষ্ঠে থেকে আটাশ মিটারের মধ্যে, বাকীটা রয়েছে অনেক গভীর তলে। আমেরিকান বিজ্ঞানী রেমন্ড নেস্ কিন্তু ভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেছেন, ভূগর্ভের মোট জলের পরিমাণ 4,000000 ঘন

কিলোমিটারের বেশী নয়। স্পষ্টতঃই এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা ও উন্নত পরিমাপন-পদ্ধতির প্রয়োজন রয়েছে। ভূগর্ভের গভীর অভ্যন্তরের জলে প্রচুর পরিমাণ লবণ দ্রবিত আছে, বিশেষ করে সোডিয়াম ক্লোরাইড। ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি তলের জলে লবণের পরিমাণ অনেকটা কম এবং সেজন্য আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের উপযোগী। মেরু অঞ্চলে, সাইবেরিয়ার উত্তরাংশে, কোন কোন জায়গায় ভূগর্ভেও জল কঠিন বরফাকারে রয়েছে।

মরুভূমি ছাড়া, অন্যান্য ভূভাগের মৃত্তিকা সবই কমবেশী আর্দ্র বা জলসিক্ত। অর্থাৎ জমিতে সর্বদাই কিছু জল বিধৃত হয়ে থাকে। এই মৃত্তিকা-সংহত জলের (soil moisture) পরিমাণ 80,000 ঘন কিলোমিটার, এই জলের উপর শস্যের ফলন অনেক নির্ভরশীল। মাটি সর্বত্র একরকম আর্দ্র নয় এবং ঋতুর সঙ্গে আর্দ্রতারও পরিবর্তন হয়। সেই হেতু ভাল ফসল উৎপাদনের জন্য সেচ-ব্যবস্থা চালু করতে হয়েছে।

বর্তমানে সেচের আওতায় সারা পৃথিবীতে আছে 220 মিলিয়ন হেক্টার জমি। তার মধ্যে গম চাল ইত্যাদি দানাশস্য জন্মায় 160 মিলিয়ন হেক্টারে, অন্যান্য খাদ্যশস্য শাকসবজী ইত্যাদি জন্মায় 30 মিলিয়ন হেক্টারে আর তুলা, পাট, ইত্যাদি পণ্যশস্য হয় বাকী 30 মিলিয়ন হেক্টারে। সেচ-বহির্ভূত আবাদী জমির পরিমাণ 1050 মিলিয়ন হেক্টার। সেচের জমির ফলন গড়ে সেচের বাইরের জমির ফলনের প্রায় পাঁচ-ছয় গুণ প্রতি হেক্টারে। অবশ্য এ জমিতে উন্নত বীজ, উন্নত চাষ-পদ্ধতি, উপযুক্ত সার প্রভৃতিও দেওয়া হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োজন মত জল না দিলে আশানুরূপ ফলন হবে না। বর্তমান সারা পৃথিবীতে সেচের জন্য জল ব্যবহৃত হচ্ছে 2500 ঘন কিলোমিটার, এর এক-চতুর্থাংশ অবশ্য অব্যবহৃত হয়ে নদীনালাতেই ফিরে আসে। কলকারখানা, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে, জলপথে মাল পরিবহনে এবং অন্যান্য নানা কাজে প্রভূত জল প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু জলের সর্বাধিক চাহিদা ফসল-উৎপাদনে। এ শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর সব মানুষকে নিম্নতম পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে হলে অন্ততঃ 500 মিলিয়ন হেক্টার জমি সেচের অধীনে আনতে হবে এবং তার জন্য সেচের জল প্রয়োজন হবে 4500 ঘন কিলোমিটার। প্রতি হেক্টারে সেচের জন্য অন্ততঃ 9000 ঘন মিটার জল বছরে প্রয়োজন হয়।

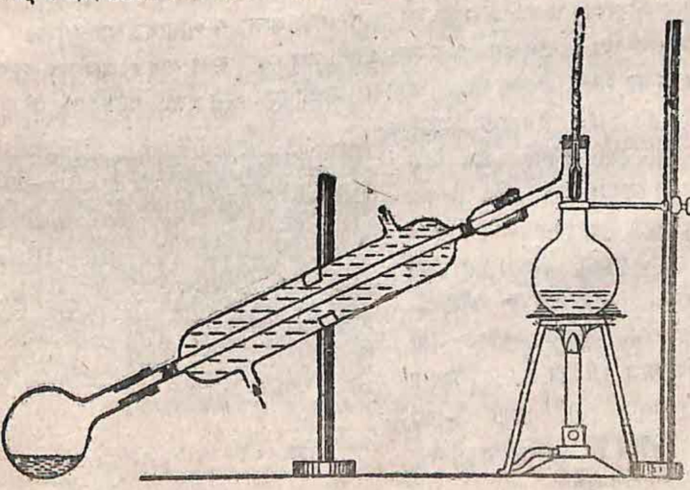
৭। জলের শোধন

নিত্যব্যবহারের জন্য জল আমরা নানা জায়গা থেকে পাই; নদী, পুকুর, খাল, বিল, কুয়ো থেকে প্রধানতঃ জল সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া, বৃষ্টির জল এবং তুষার-গলা জলও আছে। জলে সর্বদাই কিছু ময়লা থাকে। অবশ্য এর মধ্যে পাহাড়ের উপরের বরফ-গলা জল এবং আকাশ থেকে পাওয়া বৃষ্টির জলই সব থেকে বিশুদ্ধ, ময়লা প্রায় নেই বললেই চলে। জলের ময়লা দুই ধরনের। একটি হল যে ময়লা ভাসে বা প্রলম্বিত হয়ে থাকে, দ্রব হয় না। এ রকম ময়লা চোখেই দেখা যায়, যেমন পুকুর বা নদীর জলে দেখা যায় খানিকটা বালু বা কাদামাটি ইত্যাদি রয়েছে। ঝরনার জলে

বা প্রস্রবণের জলে এরকম ময়লা থাকে না। ফিলটার কাগজ বা ন্যাকড়া দিয়ে এরকম ময়লা সরিয়ে নেওয়া যায়। অনেকটা জল পরিশ্রুত করতে হলে সেই জলকে মিহি বালুর স্তরের ভিতর দিয়ে পরিচালিত করা হয়। ভাসমান ময়লাগুলো বালুর স্তরে আটকে থাকে। দ্বিতীয় রকমের ময়লাগুলো জলে দ্রবিত হয়ে থাকে, আমরা চোখে দেখতে পাই না। জল মাটি থেকে নানারকম লবণ ও খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত করে নিয়ে আসে। সামান্য বাতাসও জলে দ্রব হয়, তার মধ্যে বিশেষ করে কার্বন-ডাইঅকসাইড যুক্ত হলে মাটির খনিজ লবণ আরও বেশী দ্রব হয়। দ্রবিত ময়লা কি হবে সেটা নির্ভর করে সেখানকার জমির রাসায়নিক প্রকৃতির উপরে। বীরভূমের কোন কোন প্রস্রবণের জলে গন্ধক-যৌগ দেখা যায়, আবার উত্তরবঙ্গের কুয়োর জলে প্রচুর লোহ-যৌগিক দ্রবিত রয়েছে দেখা যায়। এ ছাড়া প্রায় সর্বত্রই জলে খানিকটা ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের বাইকার্বনেট ও সালফেট লবণ থাকে। সহরাঞ্চলে, বিশেষ করে যেখানে কলকারখানা রয়েছে, সেখানকার বাতাসে সালফার-ডাইঅকসাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি থাকে, তাই সেখানে জল ঐ সকল গ্যাস শোষণ করে দূষিত হয়ে পড়ে।

জলে যে দ্রবিত মালিন্য রয়েছে তা বেশ সহজেই প্রমাণ করা যায়। খানিকটা কুয়োর জল বা পরিস্রুত নদীজল একটি পাত্রে নিয়ে ফোটাতে হয়। সমস্ত জলটা উবে গেলে পাত্রের নীচে খানিকটা সাদা গুঁড়ো পড়ে থাকে। ঐ লবণ জলে দ্রবিত ছিল, ফোটানোর সময় উদ্বায়ী জল উড়ে গেছে, অনুদ্বায়ী লবণ রয়ে গেছে।

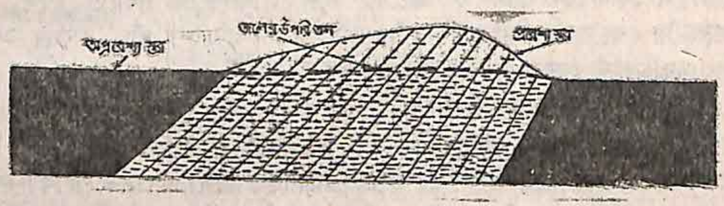
অনেক কাজে আমাদের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জল প্রয়োজন, যার মধ্যে একেবারেই ময়লা থাকবে না। ল্যাবরেটরীর নানা পরীক্ষাতে, ইনজেকসনে ও হাসপাতালের কাজে, ব্যাটারীতে, ফটোগ্রাফির কাজ ইত্যাদিতে বিশুদ্ধ জল ছাড়া চলে না। প্রাকৃত জলকে পাতিত করে এই বিশুদ্ধ জল তৈরী করা হয়। পাতন যন্ত্রের একটি ছবি দেওয়া হল (চিত্র ২৪)।



চিত্র ২৪। পাতন-যন্ত্র

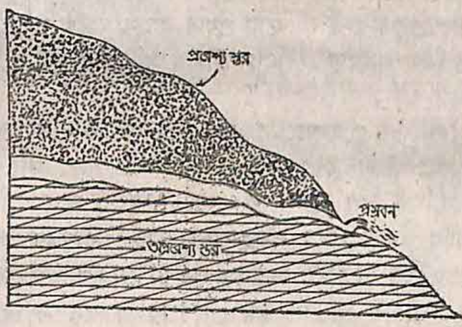
একটি ফ্লাস্কে সাধারণ জল নিয়ে সামান্য পটাস পারমাঙ্গানেট মিলিয়ে ফোটানো হয়।

শিলাস্তর আর দ্বিতীয় রকমের শিলাতে জল ঢুকতে পারে না, এগুলি "অপ্রবেশ্য" শিলাস্তর। প্রবেশ্য স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে জল শেষপর্যন্ত নীচে এক অপ্রবেশ্য স্তরে পৌঁছয়। তখন আর না যেতে পেরে জল সেখানে জমতে শুরু করে। এমনি করে ভূগর্ভস্থ জল সঞ্চিত হয় (চিত্র ২১)। সেখানে যত বেশী জমে, সঞ্চিত জলের



চিত্র ২১। ভূগর্ভস্থ জল সঞ্চয়

উপরি-তল (water table) তত উচু হতে থাকে। এমনি করে জল অপ্রবেশ্য স্তরের উপর জমে আর যখন নীচে যাবার পথ পায় না তখন উপরের দিকে বাইরে আসার পথ পেলে সেখান দিয়ে সবেগে বেরিয়ে আসে। ভূগর্ভ থেকে জলের এই স্বতঃ উৎসারণকে বলে "প্রস্রবণ" (চিত্র ২২)। অনেক প্রস্রবণ আছে যেখানে শত শত বছর ধরে



চিত্র ২২। প্রস্রবণ

প্রস্রবণের ধারা নিয়ত উৎসারিত হয়ে আসছে। কাশ্মীরের পাহাড়ের গায়ের মনোরম উদ্যানগুলিতে রয়েছে এই রকমের বড় বড় অবিরাম প্রস্রবণ। ঐ জলধারা কেন্দ্র করেই মোগল বাদশাহেরা ঐসব অপূর্ব উদ্যান গড়ে তুলেছিলেন।

অপ্রবেশ্য শিলাস্তর মাটির নীচে যদি হেলান থেকে তবে নির্গম পথ দিয়ে প্রস্রবণের ধারা খানিকটা বেরিয়ে গেলে জলের উপরিতল নির্গমমুখের নীচে চলে যায় এবং প্রস্রবণের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। আবার জল সঞ্চিত হলে তখন প্রস্রবণের উৎসারণ দেখা দেয়। এরা "সবিরাম প্রস্রবণ"; কোন কোন জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এরকম প্রস্রবণ দেখা যায়। শিলাস্তরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় জল নানারকম লবণ খনিজপদার্থ ইত্যাদি দ্রবিত করে নেয়। সেই জন্য প্রস্রবণের জলে প্রায়ই নানা ধাতব পদার্থ থাকে। খুব বেশী পরিমাণে এসব পদার্থ থাকলে, এদের বলা হয় "খনিজ

প্রস্রবণ"। ইংলন্ডের বাথে, ইউরোপের কার্লসবাদে, এরকম খনিজ প্রস্রবণ রয়েছে। কোন কোন রোগ উপশমের জন্যও এরূপ খনিজ প্রস্রবণ-জল ব্যবহার হয়।

মাটির অনেক নীচে জল চলে গেলে বা আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে মাটির তলে জল সঞ্চিত হলে, সেই জল খুব গরম হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে প্রস্রবণের ধারা খুব উত্তপ্ত থাকে; এদের "উষ্ণ প্রস্রবণ" বলে। বীরভূমের বক্রেশ্বরে, বিহারের রাজগীরে, বাংলাদেশের চন্দ্রনাথে, মুঙ্গেরের সীতাকুন্ডে, হিমালয়ের বদরীনারায়ণে এরকম সব উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। নীচে তাপমাত্রা যদি খুবই বেশী হয় তবে উত্তপ্ত জল উপরে উঠে আসার সময় খানিকটা বাষ্প হয়ে বের হয়। সেই বাষ্প উষ্ণ জল নিয়ে প্রস্রবণের মুখ দিয়ে উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। এরকম বাষ্প-মিশ্রিত প্রস্রবণকে বলে, "গীজার" (geyser)। আইসল্যান্ডে, নিউজিল্যান্ডে অনেক গীজার দেখা যায়। আমেরিকার ইয়োলো-স্টোন পার্কে ওল্‌ড ফেথফুল (Old Faithful) নামে এক প্রসিদ্ধ গীজার আছে; একঘন্টা পরপর অত্যুষ্ণ জল ও বাষ্প সেখান থেকে প্রায় ত্রিশ মিটার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে থাকে।

ভূগর্ভস্থ জল আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। নদীনালা যেখানে কম, বা শীতের সময় যখন নদীনালা শুকিয়ে যায় তখন জল পাওয়ার জন্য কূপ বা নলকূপের উপর নির্ভর করতে হয়। দৈনন্দিন প্রয়োজনে ত বটেই, কৃষিকাজেও নলকূপের জল ব্যবহার হয়। আজকাল এ রাজ্যে বহু অগভীর নলকূপ বসিয়ে সেচের জল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। উন্মুক্ত কূপগুলি সাধারণতঃ আর্টেজীয় কূপ (Artesian well)। এটাকে একরকম কৃত্রিম প্রস্রবণ বলা যেতে পারে। দুটো অপ্রবেশ্য স্তরের মধ্যে চাঁদের ফালির মত বাঁকানো যদি একটা প্রবেশ্য স্তর থাকে, আর এই প্রবেশ্য স্তরের প্রান্তভাগ যদি দূরে কোথাও ভূপৃষ্ঠে উন্মুক্ত থাকে, তবে দুই অপ্রবেশ্য স্তরের মধ্যে জল জমে (চিত্র ২৩)। জলের উপরিতল ক্রমশ উচু হতে থাকে। এখন উপরের অপ্রবেশ্য স্তরের মধ্য দিয়ে 'w' চিহ্নিত অংশে কুয়ো খুঁড়লে নীচের জল উপরিতলের লেভেলে আসবেই। এটাই আর্টেজীয় কূপ। এই জল তখন সংগ্রহ করে (প্রয়োজন হলে পাম্প বসিয়ে) ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ২৩। আর্টেজীয় কূপ

ভূগর্ভে সঞ্চিত সলিল-সম্পদের একটা পরিমাণ রুশবিজ্ঞানী মাকারেন্‌কো করেছেন। তাঁর হিসাব মতো মাটির নীচে 60,000000 ঘন কিলোমিটার জল আছে। এর মধ্যে মাত্র 4,000000 ঘন কিলোমিটার আছে ভূপৃষ্ঠ থেকে আটাশ মিটারের মধ্যে, বাকীটা রয়েছে অনেক গভীর তলে। আমেরিকান বিজ্ঞানী রেমন্ড নেস্ কিন্তু ভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেছেন, ভূগর্ভের মোট জলের পরিমাণ 4,000000 ঘন

কিলোমিটারের বেশী নয়। স্পষ্টতঃই এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা ও উন্নত পরিমাপন-পদ্ধতির প্রয়োজন রয়েছে। ভূগর্ভের গভীর অভ্যন্তরের জলে প্রচুর পরিমাণ লবণ দ্রবিত আছে, বিশেষ করে সোডিয়াম ক্লোরাইড। ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি তলের জলে লবণের পরিমাণ অনেকটা কম এবং সেজন্য আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের উপযোগী। মেরু অঞ্চলে, সাইবেরিয়ার উত্তরাংশে, কোন কোন জায়গায় ভূগর্ভেও জল কঠিন বরফাকারে রয়েছে।

মরুভূমি ছাড়া, অন্যান্য ভূভাগের মৃত্তিকা সবই কমবেশী আর্দ্র বা জলসিক্ত। অর্থাৎ জমিতে সর্বদাই কিছু জল বিধৃত হয়ে থাকে। এই মৃত্তিকা-সংহত জলের (soil moisture) পরিমাণ 80,000 ঘন কিলোমিটার, এই জলের উপর শস্যের ফলন অনেক নির্ভরশীল। মাটি সর্বত্র একরকম আর্দ্র নয় এবং ঋতুর সঙ্গে আর্দ্রতারও পরিবর্তন হয়। সেই হেতু ভাল ফসল উৎপাদনের জন্য সেচ-ব্যবস্থা চালু করতে হয়েছে।

বর্তমানে সেচের আওতায় সারা পৃথিবীতে আছে 220 মিলিয়ন হেক্টার জমি। তার মধ্যে গম চাল ইত্যাদি দানাশস্য জন্মায় 160 মিলিয়ন হেক্টারে, অন্যান্য খাদ্যশস্য শাকসবজী ইত্যাদি জন্মায় 30 মিলিয়ন হেক্টারে আর তুলা, পাট, ইত্যাদি পণ্যশস্য হয় বাকী 30 মিলিয়ন হেক্টারে। সেচ-বহির্ভূত আবাদী জমির পরিমাণ 1050 মিলিয়ন হেক্টার। সেচের জমির ফলন গড়ে সেচের বাইরের জমির ফলনের প্রায় পাঁচ-ছয় গুণ প্রতি হেক্টারে। অবশ্য এ জমিতে উন্নত বীজ, উন্নত চাষ-পদ্ধতি, উপযুক্ত সার প্রভৃতিও দেওয়া হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োজন মত জল না দিলে আশানুরূপ ফলন হবে না। বর্তমান সারা পৃথিবীতে সেচের জন্য জল ব্যবহৃত হচ্ছে 2500 ঘন কিলোমিটার, এর এক-চতুর্থাংশ অবশ্য অব্যবহৃত হয়ে নদীনালাতেই ফিরে আসে। কলকারখানা, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে, জলপথে মাল পরিবহনে এবং অন্যান্য নানা কাজে প্রভূত জল প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু জলের সর্বাধিক চাহিদা ফসল-উৎপাদনে। এ শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর সব মানুষকে নিম্নতম পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে হলে অন্ততঃ 500 মিলিয়ন হেক্টার জমি সেচের অধীনে আনতে হবে এবং তার জন্য সেচের জল প্রয়োজন হবে 4500 ঘন কিলোমিটার। প্রতি হেক্টারে সেচের জন্য অন্ততঃ 9000 ঘন মিটার জল বছরে প্রয়োজন হয়।

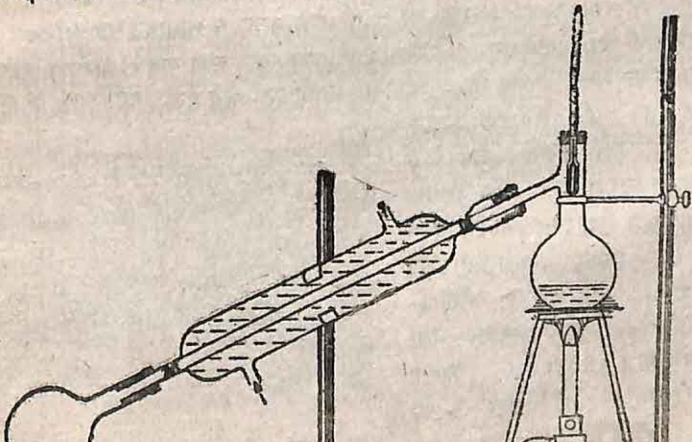
৭। জলের শোধন

নিত্যব্যবহারের জন্য জল আমরা নানা জায়গা থেকে পাই; নদী, পুকুর, খাল, বিল, কুয়ো থেকে প্রধানতঃ জল সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া, বৃষ্টির জল এবং তুষার-গলা জলও আছে। জলে সর্বদাই কিছু ময়লা থাকে। অবশ্য এর মধ্যে পাহাড়ের উপরের বরফ-গলা জল এবং আকাশ থেকে পাওয়া বৃষ্টির জলই সব থেকে বিশুদ্ধ, ময়লা প্রায় নেই বললেই চলে। জলের ময়লা দুই ধরনের। একটি হল যে ময়লা ভাসে বা প্রলম্বিত হয়ে থাকে, দ্রব হয় না। এ রকম ময়লা চোখেই দেখা যায়, যেমন পুকুর বা নদীর জলে দেখা যায় খানিকটা বালু বা কাদামাটি ইত্যাদি রয়েছে। ঝরনার জলে

বা প্রস্রবণের জলে এরকম ময়লা থাকে না। ফিলটার কাগজ বা ন্যাকড়া দিয়ে এরকম ময়লা সরিয়ে নেওয়া যায়। অনেকটা জল পরিশ্রুত করতে হলে সেই জলকে মিহি বালুর স্তরের ভিতর দিয়ে পরিচালিত করা হয়। ভাসমান ময়লাগুলো বালুর স্তরে আটকে থাকে। দ্বিতীয় রকমের ময়লাগুলো জলে দ্রবিত হয়ে থাকে, আমরা চোখে দেখতে পাই না। জল মাটি থেকে নানারকম লবণ ও খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত করে নিয়ে আসে। সামান্য বাতাসও জলে দ্রব হয়, তার মধ্যে বিশেষ করে কার্বন-ডাইঅকসাইড যুক্ত হলে মাটির খনিজ লবণ আরও বেশী দ্রব হয়। দ্রবিত ময়লা কি হবে সেটা নির্ভর করে সেখানকার জমির রাসায়নিক প্রকৃতির উপরে। বীরভূমের কোন কোন প্রস্রবণের জলে গন্ধক-যৌগ দেখা যায়, আবার উত্তরবঙ্গের কুয়োর জলে প্রচুর লৌহ-যৌগিক দ্রবিত রয়েছে দেখা যায়। এ ছাড়া প্রায় সর্বত্রই জলে খানিকটা ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের বাইকার্বনেট ও সালফেট লবণ থাকে। সহরাঞ্চলে, বিশেষ করে যেখানে কলকারখানা রয়েছে, সেখানকার বাতাসে সালফার-ডাইঅকসাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি থাকে, তাই সেখানে জল ঐ সকল গ্যাস শোষণ করে দূষিত হয়ে পড়ে।

জলে যে দ্রবিত মালিন্য রয়েছে তা বেশ সহজেই প্রমাণ করা যায়। খানিকটা কুয়োর জল বা পরিস্রুত নদীজল একটি পাত্রে নিয়ে ফোটাতে হয়। সমস্ত জলটা উবে গেলে পাত্রের নীচে খানিকটা সাদা গুঁড়ো পড়ে থাকে। ঐ লবণ জলে দ্রবিত ছিল, ফোটানোর সময় উদ্বায়ী জল উড়ে গেছে, অনুদ্বায়ী লবণ রয়ে গেছে।

অনেক কাজে আমাদের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জল প্রয়োজন, যার মধ্যে একেবারেই ময়লা থাকবে না। ল্যাবরেটরীর নানা পরীক্ষাতে, ইনজেকসনে ও হাসপাতালের কাজে, ব্যাটারীতে, ফটোগ্রাফির কাজ ইত্যাদিতে বিশুদ্ধ জল ছাড়া চলে না। প্রাকৃত জলকে পাতিত করে এই বিশুদ্ধ জল তৈরী করা হয়। পাতন যন্ত্রের একটি ছবি দেওয়া হল (চিত্র ২৪)।

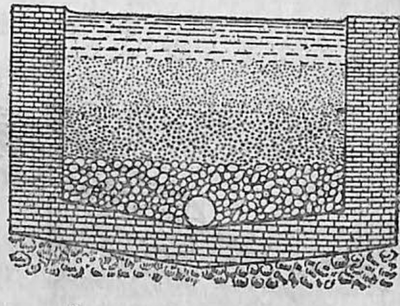


চিত্র ২৪। পাতন-যন্ত্র

একটি ফ্লাস্কে সাধারণ জল নিয়ে সামান্য পটাস পারমাঙ্গানেট মিলিয়ে ফোটানো হয়।

উত্তপ্ত বাষ্প ফ্লাস্ক থেকে বেরিয়ে একটি ঢালু এবং সরু শীতক-নলে প্রবেশ করে। ঠাণ্ডা হয়ে বাষ্প বিশুদ্ধ তরল জলে পরিণত হয় এবং গড়িয়ে এসে নীচের একটি আধারে সঞ্চিত হয়। শীতক-নলটির চারিদিকে সর্বদা ঠান্ডা জল প্রবাহিত করতে হয়। পারমাঙ্গানেট মেশানোর ফলে জৈবজাতীয় ময়লা এবং অনেক জীবাণু দূর করা সম্ভব হয়।

দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কাজে অবশ্য আমাদের এত বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজন নেই। মনে হতে পারে, পানীয় হিসেবে বিশুদ্ধ জলই সব চেয়ে ভাল হবে, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। পানীয় জলে অবশ্যই কোন দূষিত ময়লা থাকবে না, কিন্তু কিছু খনিজ লবণ এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইড দ্রবিত থাকা স্বাস্থ্যের দিক থেকে এবং স্বাদের দিক থেকে কাম্য। পাতিত না করে নদী পুকুর প্রভৃতির জলকে প্রয়োজনমত শোধন করে পানীয় রূপে ব্যবহার করা হয়। নদীতীরবর্তী সহরে সর্বদাই নদীজল ব্যবহার করা হয়। কলকাতার জল অধিকাংশই হুগলী নদী থেকে সরবরাহ করা হয়। পাম্প দিয়ে নদীর জল তুলে এনে কতকগুলো জলাশয়ে রেখে দেওয়া হয়। খাদ কেটে নদীর তীরে বড় পুষ্করিণীর মত এই জলাশয়গুলি তৈরী করে নেওয়া হয়। এখানে জলের ভাসমান ময়লাগুলি থিতিয়ে যায়। লোহার-জালির খাঁচায় করে বড় বড় ফটকিরিখণ্ড এই জলাশয়ে ডুবিয়ে রাখা হয়। ফটকিরি ভাসমান ময়লাগুলিকে অনেক সহজে থিতিয়ে দেয়। এই সময় সূর্যকিরণেও অনেক জীবাণু মরে যায়। এই জলাশয়গুলির পাশেই থাকে ইটের তৈরী চৌবাচ্চার মত কতগুলি বিরাট পরিস্রুতি-আধার। এই আধারের তলদেশ সমতল নয়। মাঝখানটা ঢালু ও নীচু হয়ে গেছে (চিত্র ২৫)। পরিস্রুতি-আধারের নীচের অংশে থাকে প্রায় দুই মিটার কাঁকর এবং পাথরের নুড়ি। তার উপরে মোটা বালুর পুরু স্তর থাকে এবং সর্বোপরি থাকে মিহিবালুর স্তর। জলাশয় থেকে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জল এই জলাধারে আসে এবং বালু ও পাথরের স্তর অতিক্রম করে নীচে এসে জমা হয়। সেখান থেকে জল একটা নল বেয়ে চলে যায়। বালু ও পাথরের স্তর দিয়ে যাবার সময় জলের সমস্ত অদ্রাব্য ময়লা তো দূর হয়ই, অধিকাংশ জীবাণুও দূরীভূত হয়। এই পরিস্রুত জলকে পাম্পের সাহায্যে একটি খুব উঁচু ট্যাঙ্কে তুলে দেওয়া হয় এবং সেখান থেকে নল বেয়ে সহরের নানা দিকে সরবরাহ হয়; যেমন, কলকাতার টালা ট্যাঙ্ক থেকে। সম্পূর্ণরূপে জীবাণু-মুক্ত করার জন্য প্রায়ই জলের সঙ্গে ক্লোরিন মিশিয়ে দেওয়া হয়। আবার কোথাও কোথাও ছোট ছোট ট্যাঙ্কে অতিবেগনী রশ্মি দিয়েও জলের জীবাণু ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

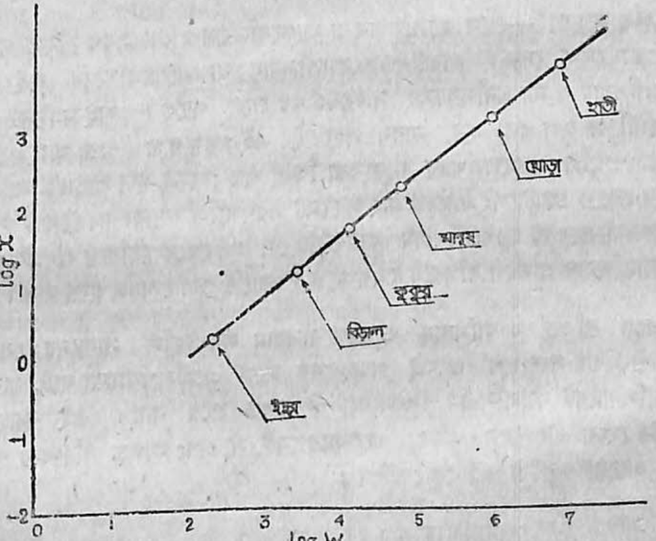


চিত্র ২৫। জল-পরিস্রুতির আধার

শরীরের জন্যে কি আমাদের প্রচুর জল দরকার? তা মানুষের দেহের বেশীর

ভাগটাই তো জল। একটি পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহের ওজনের 60% জল, আর নবজাত শিশুর 77%। শরীরের এই জলের পরিমাণ শতকরা একভাগ কমে গেলেই আমরা তীব্র পিপাসায় অস্থির হয়ে পড়ি। আরও বেশী কমলে নিদারুণ অস্বস্তিবোধ হয়। নিঃশ্বাস, প্রস্রাব, ঘাম ইত্যাদির সঙ্গে প্রতিদিন একজন লোকের গড়ে 2750 সিসি জল হারিয়ে যায়, সুতরাং এই জল পূরণ করে দিতেই হয়। জলের এই লাভক্ষতির একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া হল।

জল গ্রহণ	সিসি	জল অপসারণ	সিসি
পানীয় হিসাবে	1650	ঘামের সঙ্গে	500
খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে	750	নিঃশ্বাসের সঙ্গে	400
আভ্যন্তরিক খাদ্যদ্রব্যের জারণে	350	মলের সঙ্গে	150
		প্রস্রাবের সঙ্গে	1700
	2750 সিসি		2750 সিসি



চিত্র ২৭। বিভিন্ন প্রাণীদেহে জলের চাহিদা

শুধু মানুষ কেন, অন্য সব জীবজন্তুরও এমনি জল দেওয়া-নেওয়ার একটা সাম্য রয়েছে। কয়েকটি মরুপ্রাণী ছাড়া অন্য সব প্রাণীরই জলের চাহিদা শরীরের ওজনের অনুপাতে হয়। কোন কোন বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন, W ওজনের কোন জন্তুর জলের

চাহিদা যদি x হয় তবে, উহাদের সম্পর্কটি হবে,

$$W = x^{0.88}$$

এখানকার লেখচিত্র থেকে সেটা সহজেই বুঝতে পারা যাবে (চিত্র ২৬)।

সাধারণ ধোয়া-মোছা বা পরিষ্কার করার কাজে কিংবা স্নানের জন্য আমরা সর্বদা অশোধিত জলই ব্যবহার করি, শোধন করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রায়ই অসুবিধা দেখা দেয় সাবান দিয়ে কাপড়-কাচার সময়। সাবানে থাকে সোডিয়াম অলিয়েট, সোডিয়াম স্টিয়ারেট প্রভৃতি জৈবজাতীয় যৌগ। এগুলি জলের সঙ্গে মিশে পিচ্ছিল ফেনার সৃষ্টি করে। কাপড় পরিষ্কার করার জন্য এই ফেনা প্রয়োজন, ফেনাই ময়লা টেনে নিতে পারে। কিন্তু অনেক সময় কুয়োর জল, প্রস্রবণের জল, এমনকি কোন কোন নদীজলেও ফেনা হয়না। এসব জলে সাবান যেন ছানা কেটে কেটে যায়, ফেনার পরিবর্তে গুঁড়ো গুঁড়ো তলানি পড়তে থাকে। সাবানের অযথা অপচয় হয়, ফেনার অভাবে কাপড় পরিষ্কার হয় না। এসব জলকে আমরা বলি "খর জল" আর যে জলে সাবানের ফেনা সহজেই হয় সেটা "মৃদু জল" বা "কোমল জল"।

"জলের খরতা"—জলে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম-ঘটিত লবণ দ্রবিত থাকলেই জলের খরতা দেখা দেয়। সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম বাইকার্বনেট অথবা ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের সালফেট খর জলে থাকে। বাইকার্বনেট থাকলে তাকে অস্থায়ী খর জল বলা হয়, কারণ সহজেই এই খরত্ব দূর করা যায়। কিন্তু সালফেট লবণগুলি থাকলে খরত্ব দূর করা কিছু শক্ত ; সেই জল "স্থায়ী খর জল"। অস্থায়ী খর জলকে ফোটালেই তাদের বাইকার্বনেট লবণগুলি অদ্রাব্য কার্বনেটে পরিণত হয় এবং ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটরূপে জল থেকে বেরিয়ে অধঃক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণ-মুক্ত হওয়াতে জল কোমল হয়ে যায়।

খর জলে দ্রবিত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণগুলি সাবানের সোডিয়াম স্টিয়ারেট প্রভৃতির সংস্পর্শে এলেই পরস্পরের মধ্যে একটা বিক্রিয়া ঘটে, যার ফলে সোডিয়াম স্টিয়ারেট ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেটে পরিণত হয়ে যায়। এই ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেটের ফেনা উৎপাদন ক্ষমতা একেবারে নেই, সুতরাং কাপড় পরিষ্কার হয় না। রসায়নের ছাত্রেরা এই বিক্রিয়াটিকে লেখেন ঃ

সোডিয়াম স্টিয়ারেট + ক্যালসিয়াম সালফেট = ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেট + সোডিয়াম সালফেট

এ তো হল সাবান দিয়ে কাপড় কাচার অসুবিধার কথা। খর জলের আরও অসুবিধা আছে। সবাই দেখেছেন, কেটলীতে কয়েকদিন জল ফোটালে, কেটলীর ভিতরের গায়ে একটা শক্ত সাদা প্রলেপ পড়ে। ক্রমশঃ সেটা পুরু হতে থাকে এবং সহজে তোলা যায় না। এই প্রলেপ বা স্তরে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের সালফেট ও কার্বনেট জমে। এই জমাট কলাইটা যখন যথেষ্ট পুরু হয় তখন সেই কেটলীতে জল ফোটাতে

অনেক সময় লাগে এবং জ্বালানিও বেশী লাগে। ছোট কেটলীর জল ফোটাতে কয়লার যে অপচয় হয় সেটা হয়ত তেমন গায়ে লাগবে না। কিন্তু যখন এরকম জল বয়লারে প্রচুর ব্যবহার করা হয় তখন বয়লারের গায়েও বেশ পুরু স্তর জমে এবং তারপর সেই জল প্রচুর কয়লা পুড়িয়েও ফোটান দুষ্কর হয়ে ওঠে। তাছাড়া বয়লারের ক্ষতিও হয় এই কারণে। রেলের বা জাহাজের ইঞ্জিনে, ফ্যাকটরীর নানা কাজে বয়লার ব্যবহার করতে হয় এবং শত শত টন জল ফোটাতে হয়। সেখানে মোটেই খরজল ব্যবহার করা চলবে না। শুধু কয়লার অপচয় নয়, দামী বয়লারের ক্ষতি করা যায় না। জল খর হলে সেটাকে কোমলায়িত করে নিয়ে বয়লারে দিতে হবে।

পানীয় জলও অতিরিক্ত খর হওয়া ঠিক নয়, কারণ বেশী খর জল ব্যবহার করলে পেটের রোগ দেখা দেয়। জলের খরতা মাপা হয় ডিগ্রিতে। প্রতি লক্ষ ভাগ জলে একভাগ ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকলে (অথবা তার তুল্য পরিমাণ ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়ামের অন্য লবণ থাকলে) তার খরতা এক ডিগ্রি ধরা হয়। 22° ডিগ্রি খরজল বললে বুঝতে হবে ঐ জলের লক্ষ কিলোগ্রামে 22 কিলোগ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট রয়েছে। অনেক সহরের জল গভীর নলকূপ থেকে সরবরাহ করা হয়, আর সেইজল প্রায়ই বেশ খর হয়। সুতরাং জলকে কোমল করা প্রয়োজন। খরজলের কোমলায়ন করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে; দুই একটি আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রকৃতিজাত একরকম খনিজ মাটি পাওয়া যায়, যার নাম জিয়োলাইট; এরা হচ্ছে সোডিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম-সিলিকেট [সঙ্কেত, $Na_2Al_2Si_4O_{12}$]। আজকাল এরকম পদার্থ কৃত্রিম উপায়েও তৈরী হয়েছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে, পারমুটিট (permutit); আমরা সংক্ষেপে একে লিখব, NaP। খরজলের ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম-জাত পদার্থগুলি আয়নিত অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ সেখানে Ca^{++} এবং Mg^{++} আয়ন থাকে। এই সব আয়ন NaP-এর সংস্পর্শে এলে তারা পারমুটিটের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সোডিয়ামকে প্রতিস্থাপিত করে দেয়। যে বিক্রিয়া ঘটে তাকে লেখা যায়ঃ

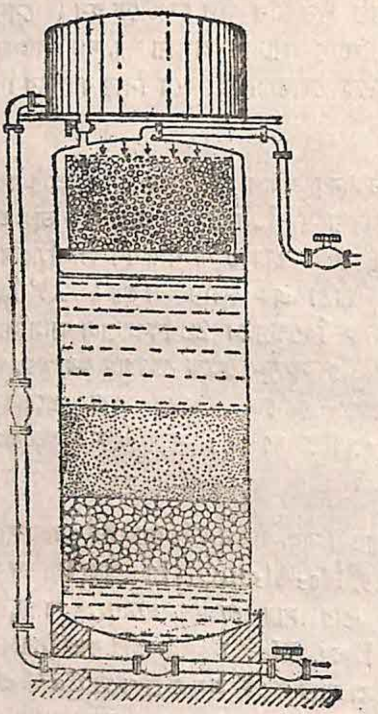
2Na-P + Ca-সালফেট = সোডিয়াম সালফেট + $Ca\text{-}P_2$

2Na-P + Mg-বাইকার্বনেট = সোডিয়াম বাইকার্বনেট + $Mg\text{-}P_2$, ইত্যাদি।

এর ফলে জলে আর ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম থাকে না, সেগুলো অদ্রব পারমুটিটে চলে যায়। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম দূর হয়ে যাওয়াতে জলের খরতা লোপ পায়। সাধারণতঃ উঁচু একটি টাওয়ারের মধ্যে পারমুটিট রেখে উপর থেকে নীচে খর-জল পরিচালনা করা হয় (চিত্র ২৭)। পারমুটিট স্তরের উপরে ও নীচে খানিকটা

মোটা বালু ও পাথরের নুড়ি থাকে। পারমুটিট স্তর জলের ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম টেনে নেয়, টাওয়ারের তলায় এসে মৃদুজল সঞ্চিত হয়।

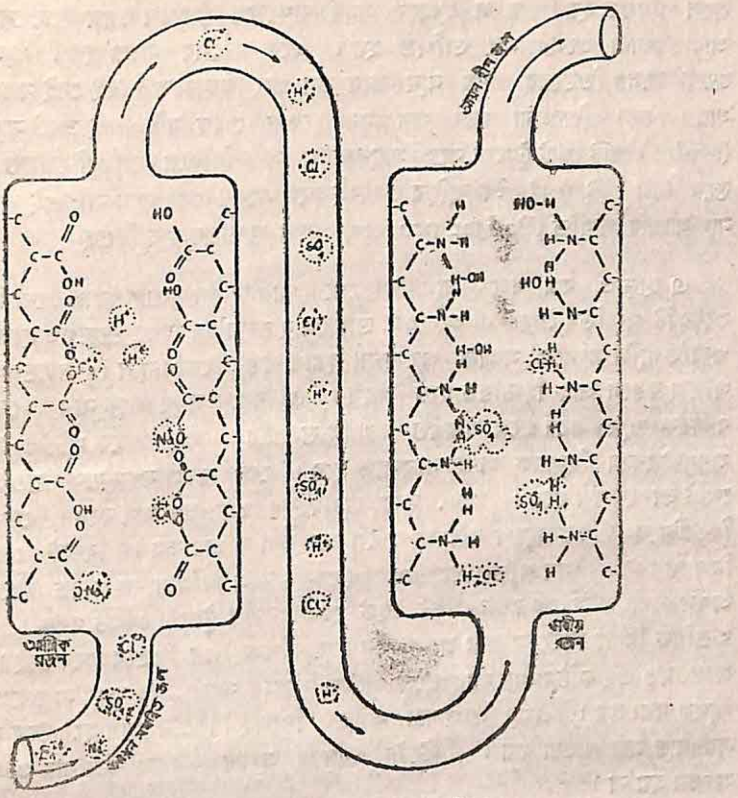
কয়েকদিন ব্যবহার করলে পারমুটিটের খরতা-দূরীকরণ ক্ষমতা লোপ পায়, কারণ তার প্রায় সবটাই CaP_2-তে পরিণত হয়ে যায়। তখন ঐ পারমুটিটকে পুনরুজ্জীবিত করে নিতে হয়। খাদ্য লবণের গাঢ় দ্রবণ উপর থেকে প্রবাহিত করলেই তাতে আবার NaP তৈরী হয়। সুতরাং সেটা দিয়েই পুনরায় জলের কোমলায়ন করা যায়। অতএব, একই পারমুটিট বহুদিন ব্যবহার করা যেতে পারে।



চিত্র ২৭। পারমুটিট পদ্ধতিতে জলের কোমলায়ন

আয়ন-সমন্বিত নানা রকমের রজন (resin) আজকাল তৈরী হয়েছে। এদের কতকগুলি অম্লজাতীয়, যাতে H^+-আয়ন আছে, আবার কতকগুলি ক্ষারীয়, যাতে OH^--আয়ন আছে। এই দুই জাতীয় রজন দুইটি প্রকোষ্ঠে পরপর রেখে খরজল পরিচালিত করলে জলের সব রকম আয়ন দূর করা যায় (চিত্র ২৮)। এতে জল শুধু মৃদু নয়, বিশুদ্ধও হয়। প্রথমে আম্লিক রজনগুলি প্রবাহিত খরজল থেকে Ca^{++}, Mg^{++}, Fe^{++}, ইত্যাদি আয়ন শোষণ করে নেয় এবং পরিবর্তে H^+-আয়ন ছেড়ে দেয়। এই জল অতঃপর ক্ষারীয় রজনের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। সেখানে OH^--আয়নগুলির স্থলে অপরা-আয়ন SO_4^{--}, CO_3^{--} ইত্যাদি শোষিত হয়। ফলে, জলে প্রায় কোন আয়নই থাকে না, বিশুদ্ধ কোমল জল পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিটির নাম "Deionisation of water"।

খরজলের অসুবিধার কথা এর আগে বলেছি। আরও নানা অসুবিধা আছে খরজল নিয়ে। চামড়া ট্যান করা যায় না খরজলে। খরজলের ক্যালসিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ট্যানিন নষ্ট হয়ে যায়। কাগজের প্রস্তুতিতে বা চিনির কলেও খরজল চলবে না! চিনির কেলাসনে ওসব থাকা সঙ্গতও নয়। ভাল দানা বাঁধে না। বস্ত্ররঞ্জনে খরজল একেবারেই অচল। এইসব কারণেই খরজল কোমলায়িত করা বিশেষ দরকার।



চিত্র ২৮। রজন সাহায্যে জলের আয়ন দূরীকরণ

সাগরজলের লবণতা অপসারণ

অনেক সমুদ্র-উপকূলবর্তী স্থানে স্বাদু জলের খুব অভাব দেখা যায়। কাছেপিঠে কোন নদী বা জলাধার নেই বলে এসব জায়গায় সমুদ্রজলকে ব্যবহার-যোগ্য করতে পারলে খুব সুবিধা হয়। অনেকদিন থেকেই সমুদ্রের নোনাজলকে লবণমুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে। বলা যেতে পারে, সমুদ্রজল পাতিত করেই ত লবণ দূর করা সম্ভব। কিন্তু এতে জ্বালানির খরচ পড়ে খুব বেশী। প্রতি পাউণ্ড জলের জন্য প্রায় 1000 BTU তাপশক্তির প্রয়োজন হয়। জাহাজে এরকম পাতন করে নেওয়া জল ব্যবহার হয় বটে, তবে সেখানে ইঞ্জিনের উদ্বৃত্ত তাপ একাজের জন্য পাওয়া যায়। ধনকুবেরের দেশ কুয়াইতে অবশ্য সমুদ্রজলের "পাতন" করেই স্বাদু জল সরবরাহ করা হয়েছে। পাতন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আজকাল খরচ অনেকটা কমান সম্ভব হয়েছে। সমুদ্রজলকে কতকগুলি উত্তপ্ত মোটা নলের ভেতর দিয়ে পরিচালিত করলে তার খানিকটা বাষ্পীভূত

হয়। সেই বাষ্পকে অনেকগুলো সরু নলে পরিচালিত করলে সেটা তরল বিশুদ্ধ জলে পরিণত হয়। তরল হওয়ার সময় বাষ্প যে লীনতাপ ত্যাগ করে, সেই তাপেই আবার লোনা জলের নল তাপিত হয়। এতে তাপের সাশ্রয় হয়। কিন্তু লোনা জলের নলের ভিতরের গায়ে নুন জমে যায় এবং কিছুকাল পরেই সেই নল বন্ধ হয়ে যায়। জল পরিচালনা করা যায় না। দেখা গেছে, যদি এই জমাট নুনের শল্ক (scales) ছোট ছোট টুকরো করে সমুদ্রজলের সঙ্গে মিশিয়ে নলে পরিচালিত করা হয়, তবে নুন এই ছোট শল্ক-নুড়ির উপরেই জমে, নলের গায়ে জমে না ; এই ব্যবস্থা, যার নাম ব্যাজার পদ্ধতি (Badger process), এখন আশাপ্রদ ফল দিচ্ছে।

এ ছাড়াও, কম খরচে সাগরজল থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করার জন্যে বিজ্ঞানীরা কয়েকটি পদ্ধতির উদ্ভাবনা করেছেন, তার কোন কোনটির কিছু প্রয়োগও হচ্ছে। এই পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে এখানে। সমুদ্রজলকে খুব শীতল করলে বরফ হিমায়িত হয়ে আসে। এই বরফে লবণ থাকে না। সুতরাং এই বরফকে পৃথক করে জলে পরিণত করা যেতে পারে। সমুদ্রজলকে শীতল করার জন্য অবশ্যই কোন হিমায়ক ব্যবহার করতে হবে। কোন তরল যখন বাষ্পায়িত হয় তখন সেটি তাপশোষণ করে। ফলে, তার চারদিকের তাপমাত্রা যায় কমে। দেখা গেছে, বিউটেনকে হিমায়করূপে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বিউটেন জলের সঙ্গে মিশ খায় না। খুব শীতল সমুদ্রজলের সঙ্গে বিউটেন মিলিয়ে বাষ্পায়িত করলে, তাপ অপসারণের ফলে এক রকম কঠিন ছোট ছোট বরফের টুকরো জমতে থাকে। এগুলো বাস্তবিক কিন্তু বিউটেন এবং জলের মিশ্র বরফশিলা, এর ভিতরে লবণ নেই। ঠাণ্ডা জলস্রোতে এই কঠিনাকার বরফগুলো ধুয়ে নিয়ে (যাতে গায়ে লবণ না লেগে থাকে) পৃথক করা হয়। এখন তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিলেই বিউটেন গ্যাস হয়ে উবে যায় আর লবণমুক্ত জল পাওয়া যায়। বিউটেন গ্যাসকে আবার ব্যবহার করা যায় ও এর কোন অপচয় হয় না।

অভিসরণের কথা (osmosis) বোধ হয় অনেকেরই জানা। কোন জলীয় দ্রবণ যদি বিশুদ্ধ জল থেকে একটা "অর্ধপ্রবেশ্য ঝিল্লী বা পর্দা" (semipermeable membrane) দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়, তাহলে জল পর্দার ভিতর দিয়ে গিয়ে দ্রবণটিকে লঘুতর করে দেয়। এই পর্দাগুলোর বিশেষত্ব হল, জল অনায়াসে ঝিল্লীর ভিতর দিয়ে চলাচল করতে পারবে, কিন্তু দ্রাব (মনে কর, লবণ) এই পর্দার ভিতর দিয়ে যেতে পারবে না। অনেকটা চাপ সহ্য করতে পারে এরকম ঝিল্লী আজকাল সেলুলোজ এসিটেট থেকে তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এরকম একটা ঝিল্লীর একদিকে সমুদ্রের লোনাজল আর অপর দিকে স্বাদু জল রেখে যদি লোনাজলের দিকে অতিরিক্ত চাপ দেওয়া হয়, তবে লবণ ঝিল্লী অতিক্রম করবে না কিন্তু লবণমুক্ত জল ঝিল্লী পেরিয়ে চলে আসবে। এ পদ্ধতির প্রয়োগ খানিকটা সীমিত। কারণ, খুব বেশী চাপ দেওয়া যায় না, সেটা ঝিল্লীর সহনক্ষমতার উপরে নির্ভর করে। বস্তুতঃ এটি একটি প্রতি-অভিসরণ পদ্ধতি (Reverse osmotic method)।

আর একটি পদ্ধতির কিছু কিছু প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। খরজলের কোমলায়নে যে কৃত্রিম রজন দিয়ে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন মুক্ত করা হয়, সেই উপায়টি এখানেও প্রবর্তিত হয়েছে। পরপর সাজানো সরু সরু কতকগুলি সেলে লোনাজল ভর্তি করে নেওয়া হয়। এই সেলগুলির দুইপাশের দেওয়াল বিশেষ রকমের সরন্ধ্র (porous) রজনের তৈরী। একদিকের দেওয়াল আম্লিক রজনের (R-H), অপরদিকে ক্ষারীয় রজনের (R′-OH)। আম্লিক রজনের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে ক্যাটায়ন (Na^+-আয়ন) সহজেই অতিক্রম করার সুযোগ পাবে, কিন্তু অ্যানায়ন (Cl^--আয়ন) বাধা পাবে। সেইরূপ ক্ষারীয় রজনের দেওয়ালে বিপরীত ব্যাপার ঘটবে। সেলগুলির শেষ দুই সীমান্ত ব্যাটারীর পরা ও অপরাপ্রান্তের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। লোনাজলে সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে, অর্থাৎ সোডিয়াম আয়ন ও ক্লোরাইড আয়ন আছে। বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে Na^+ -আয়ন অপরাপ্রান্তের দিকে এবং ক্লোরাইড আয়ন পরাপ্রান্তের দিকে যেতে থাকে। সোডিয়াম আয়ন আম্লিক রজন পেরিয়ে যায় এবং সেই সময় রজনে অনেকটা শোষিতও হয়। আবার ক্লোরাইড আয়ন অপরদিকে ক্ষারীয় রজনের পর্দা অতিক্রম করে এবং অনেকটা শোষিত হয়ে যায়। এর ফলে লোনাজল ক্রমে ক্রমে আয়নমুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ জলে পরিণত হয়। এইভাবে ঈষৎ লোনাজল থেকে ব্যবহারযোগ্য জল পাওয়া যায়।

বর্তমান পৃথিবীতে অন্ততঃ পাঁচ কোটি গ্যালন সমুদ্রজল এই সব পদ্ধতি প্রয়োগ করে লবণতা-মুক্ত করে ব্যবহার করা হচ্ছে। এককালে ক্যালিফোর্নিয়ার কোয়ালিংগা জনপদে (Coalinga) পানীয় জল পাঠাতে হত ট্রাকে করে বহুদূর থেকে। প্রতি হাজার গ্যালনের জন্য খরচ পড়ত অন্ততঃ আট ডলার। এখন সেখানে দৈনিক 28000 গ্যালন স্বাদুজল তৈরী হচ্ছে সমুদ্রের জল থেকে, ব্যয় প্রতি হাজার গ্যালনে 1·45 ডলার। ফ্লোরিডার কী-ওয়েস্ট দ্বীপে নব্বুই মাইল দূর থেকে বড় পাইপে করে প্রয়োজনীয় জল পাঠাতে হত। এখন সেখানে সাগরজল শোধন করে জল সরবরাহ সম্ভব হয়েছে অনেক কম খরচায়। মনে করা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে সমুদ্রপারের জনপদে বা কোন কোন দ্বীপে যেখানেই জলকষ্ট সেইখানেই এইসব উপায়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

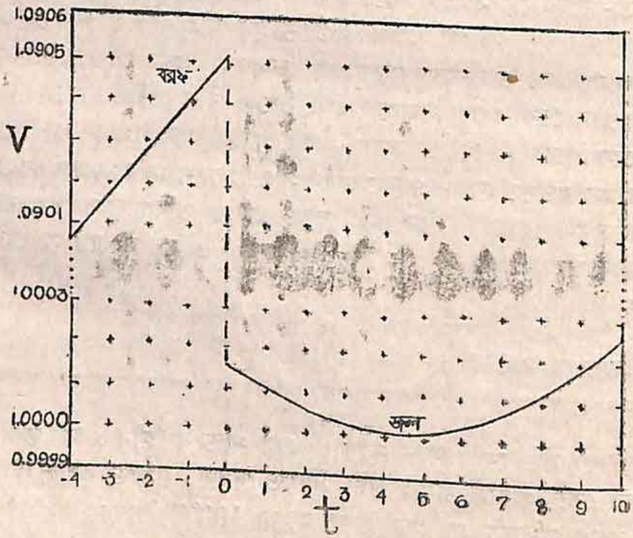
৮। জলের স্বভাব

জলের গন্ধ নেই, নেই কোন স্বাদ। জল স্বচ্ছ বর্ণহীন একটি তরল। তবে অনেকটা জল একত্র থাকলে তাকে ঈষৎ নীলাভ দেখায়। ঠাণ্ডা করলে 0°C উষ্ণতায় জল কঠিন বরফে পরিণত হয় আর উত্তপ্ত করলে 100°C উষ্ণতায় জল ফুটতে থাকে। অর্থাৎ, জলের হিমাঙ্ক 0°C এবং স্ফুটনাঙ্ক 100°C। কথাটা ঘুরিয়ে বললেই বোধ হয় ভাল হয়। বস্তুতঃ এক অ্যাটমসফিয়ার চাপে, যে তাপমাত্রায় জল জমে যায় তাকেই 0°C বলে ধরা হয়েছে এবং যে তাপমাত্রায় জল ফুটতে থাকে তাকে 100°C ধরা হয়েছে। জলের এই হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক ভিত্তি করেই তাপমাত্রার স্কেল স্থির করা হয়েছে।

হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক কিন্তু চাপের উপরে নির্ভর করে। চাপ যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায়। মনে কর, জলকে দুই অ্যাটমসফিয়ার চাপে রেখে উত্তপ্ত করা হল, তা হলে জল ফুটবে 120°C-এরও উপরে। অপরদিকে চাপ বৃদ্ধিতে জলের হিমাঙ্ক যায় নেমে। 100 অ্যাটমসফিয়ার চাপে যদি জলকে শীতল করতে থাক তাহলে সেই জল কঠিন বরফ হবে প্রায় −1°C উষ্ণতায়।

শুধু তাপমাত্রা নয়, বিজ্ঞানীদের নানা মাপজোক প্রায়ই জলের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। যেমন, জলের ঘনত্বকেই ঘনত্বের একক ধরে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এক ঘন সেন্টিমিটার (1 cc) জলের ওজনকে ধরা হয়েছে "এক গ্রাম"। এখন দেখা গেছে, পারদ জলের চেয়ে 13·6 গুণ ভারী, অর্থাৎ পারদের ঘনত্ব 13·6 গ্রাম। এই হিসাবে লোহার ঘনত্ব 7·8 গ্রাম, হীরকের 3·5 গ্রাম, গ্লিসারিনের 1·3 গ্রাম, কোহলের 0·8 গ্রাম।

জলের এই ঘনত্ব স্থির হয়েছে 4°C তাপমাত্রায়। উষ্ণতার পরিবর্তনের সঙ্গে অন্য সব তরলের মত জলেরও ঘনত্ব বদলায়। কিন্তু জলের এই পরিবর্তন একটু বিচিত্র রকমের। উষ্ণতা কমতে থাকলে জলের আয়তনও কমে, অর্থাৎ ঘনত্ব বাড়ে। এমনি করে তাপমাত্রা যখন 4°C-এ পৌঁছয়, তখন জলের ঘনত্ব হয় সর্বাধিক, অর্থাৎ প্রতি সি.সি.তে এক গ্রাম। আরও ঠান্ডা করলে জলের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু তা না হয়ে ঘনত্ব কমতে শুরু করে। তারপর 0°C-এ পৌঁছলে জল জমে বরফ হতে থাকে।



চিত্র ২৯। তাপমাত্রার সঙ্গে জলের আয়তনের পরিবর্তন

আরও একদিক দিয়ে জলের স্বভাবটা একটু বেয়াড়া রকমের। সাধারণতঃ কঠিন জিনিষ গলে গেলে তার আয়তনটা বেড়ে যায়, অর্থাৎ ঘনত্ব কমে, যেমন, মোম বা

সীসাতে। তরল মোম বা তরল সীসার ঘনত্ব তাদের কঠিন অবস্থার ঘনত্বের চেয়ে কম। কিন্তু জলের বেলাতে ঠিক এর বিপরীত ব্যাপার ঘটে। বরফ গলে গেলে আয়তন বাড়ে না, বরং কমে যায়। অর্থাৎ, বরফ জলের চেয়ে হালকা। এইজন্যে বরফ জলের উপর ভাসতে থাকে। এক গ্রাম জল 0°C-এ যখন জমে তখন তার আয়তন 1/11 অংশ বৃদ্ধি পায়. 0°C-এ বরফের ঘনত্ব 0·91 গ্রাম আর জলের ঘনত্ব 0·999 গ্রাম। এক খণ্ড বরফ সহ একটা গ্লাস জল দিয়ে কানায় কানায় ভরতি করে রাখলে, বরফের একটু অংশ উঁচু হয়ে থাকবে। বরফটা গলে গেলে কিন্তু জল উপচে পড়বে না, কারণ বরফ গলে গেলে আয়তনে কমে যায়। তাপমাত্রার সঙ্গে আয়তন কিভাবে বদলায় তার একটি ধারণা চিত্র ২৯ থেকে পাওয়া যাবে।

জলের এই বিশেষ স্বভাবটা কিন্তু বিশ্বকর্মা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই করেছেন। ঠাণ্ডাতে যখন সমুদ্রের জল জমাট বাঁধতে আরম্ভ করে, তখন বরফ হালকা বলে উপরে ভাসতে থাকে, নীচের স্তরের জল তখনও 0°C-এর কাছে তরল থাকে। উপরের বেশী চাপের জন্য এবং বরফের তাপবাহিতা কম বলে নীচের জল আর বেশী জমাট বাঁধতে পারে না। তাই মাছ আর অন্যান্য জলজীব রক্ষা পেয়ে যায়। তা না হলে নীচ থেকে শুরু করে সমুদ্রের সমস্ত জল জমে গেলে শীতের দেশের সমস্ত জলপ্রাণীর অস্তিত্বই লোপ পেয়ে যেত।

শীতপ্রধান দেশে অনেকসময় বেশী ঠাণ্ডা পড়লে জলবাহী নল ফেটে যায়। এর কারণ, নলের ভিতরে জল জমে গিয়ে আয়তন বাড়ে আর তার চাপে নল ফেটে যায়। বৃষ্টির সময় পাহাড়ের পাথরের খাঁজে খাঁজে জল প্রবেশ করে থাকে। শীতপ্রধান দেশে বা পাহাড়ের উপরের দিকে যখন তাপমাত্রা খুব কমে যায়, সেই জল জমে বরফ হয়, আয়তন বৃদ্ধি পায় সুতরাং চাপ খুব বাড়ে। সেই চাপে পাথর ফেটে চৌচির হয়ে যায়। শিলাক্ষয়ে সহায়তা হয়।

কোন তরল বা কঠিন পদার্থ রেখে দিলে তার খানিকটা বাষ্পীভূত হয়ে যায়। আবার কোন কোন কোন ক্ষেত্রে বাষ্পীভবনটা খুবই কম, নগণ্য মনে করা যেতে পারে। কোন পদার্থের সাধারণ তাপমাত্রাতেই যথেষ্ট বাষ্পীভবন হয়। যেমন, কোহল, ইথার, কর্পূর, ন্যাপথলিন ইত্যাদির উদ্বায়িতা যথেষ্ট ; কিন্তু পারদ, চিনি, কাচ, ইত্যাদির উদ্বায়িতা নেই বললেই চলে। জল কিন্তু যথেষ্ট উদ্বায়ী, সব সময়েই জল উবে যেতে চায়। তাই ভেজা কাপড়, দিদিমার ডালের বড়ি, ঠাকুমার আমসত্ত্ব সহজেই শুকিয়ে যায়। এই উদ্বায়িতা উষ্ণতা-নির্ভর, তাপমাত্রা যত বেশী হবে, বাষ্পীভবন তত বাড়বে।

বাতাস পাম্প করে বের করে দিয়ে একটা আবদ্ধ পাত্রে যদি খানিকটা জল রেখে দেওয়া হয়, তবে সেখানে কিছু বাষ্প হবেই আর সেই বাষ্পের একটা চাপও থাকবে। পাত্রের সঙ্গে সুবিধামত একটা চাপমান-যন্ত্র বা ম্যানোমিটার লাগানো থাকলে বাষ্পের চাপ সেখান থেকে জানা যায়। বিভিন্ন উষ্ণতায় বাষ্পচাপ মেপে দেখা গেছে উষ্ণতা বাড়তে থাকলে বাষ্পচাপও বাড়ে। 20°C উষ্ণতায় জলের বাষ্পচাপ 17·5 মিমি, 50°C-এ 92·5 মিমি, আর 100°C-এ 760 মিমি অর্থাৎ এক অ্যাটমসফিয়ার। কোন

তরল পদার্থের বাষ্পচাপ যখন তার উপরের চাপের সমান হয় তখনই তরলটি ফুটতে থাকে। 100°C-এ এলে জলের বাষ্পচাপ এক অ্যাটমসফিয়ার হয়, তাই 100°C-এ জল ফুটতে থাকে। মনে কর, খুব উঁচু কোন পাহাড়ে বায়ুচাপ 525 মিমি। সেখানে জল উত্তপ্ত করতে থাকলে যখন তাপমাত্রা 90°C হবে, তখন বাষ্পচাপ হবে 525 মিমি। অতএব 90°C তাপমাত্রাতেই জল সেখানে ফুটতে শুরু করবে। দার্জিলিংয়ে ডাল ভাল সেদ্ধ করা যায় না বলে যে অতসীমাসী গজ গজ করতে থাকেন, তার একটা কারণ হচ্ছে সেখানে বায়ুচাপ কম বলে, ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা 100°C-এর কম। উষ্ণতা কম বলে ডাল সেদ্ধ হতে অসুবিধা হয়।

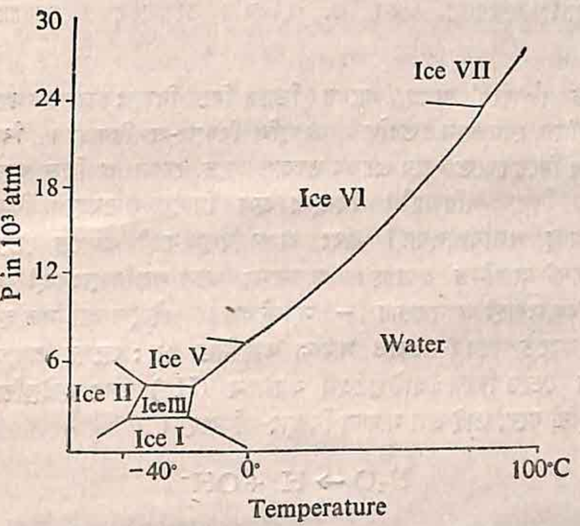
অপরদিকে, বাইরের চাপ বেশী হলে স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায়। এইজন্যই বয়লার থেকে স্টীম তৈরী করার সময় অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করা হয়। তার ফলে জল অনেক উচ্চ তাপমাত্রায় ফুটবে আর সেই স্টীমে সমধিক তাপশক্তি থাকবে। এরকম উচ্চতাপীয় স্টীম থেকে ইঞ্জিন কাজ আদায় করতে পারে অনেক বেশী।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, এমনি করে উপরের চাপ যদি খুব বেশী করে দেওয়া হয় তবে জল কি যে কোন উষ্ণতায় ফুটান সম্ভব হবে? তা কিন্তু নয়, জলের তরল অবস্থার একটা ঊর্ধ্বসীমা রয়েছে। তাপমাত্রা যদি 374°C-এর উপরে হয় তাহলে জল আর তরল থাকবে না, যতই চাপ দেওয়া হোক না কেন। এই তাপমাত্রাকে বলে "ক্রান্তিক উষ্ণতা" (Critical temperature)। এই উষ্ণতার ঊর্ধ্বে জল কেবল বাষ্পাবস্থায় থাকতে পারে।

ধর, আজ এ ঘরের তাপমাত্রা 20°C। এখানে একটি পাত্রে যদি জল রেখে দেওয়া হয়, তাহলে খানিকটা জল বাষ্পীভূত হবে, যতক্ষণ না এই উষ্ণতার বাষ্পচাপ সৃষ্টি হয় (17·5 মিমি)। এই চাপে এবং উষ্ণতায় জল ও বাষ্প সাম্যাবস্থায় থাকবে। এখন যদি এই জলে একটু বরফ মিশিয়ে দিই, তাহলে দেখা যাবে বরফ আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত বরফ আর থাকবে না ; এই উষ্ণতায় বরফের বাষ্পচাপ জলের চেয়ে বেশী। বস্তু মাত্রই নিম্নচাপে যেতে চেষ্টা করে ; তাই বরফ গলে যায়, যাতে কম বাষ্পচাপ হয়। তেমনি, খুব শীতল অবস্থায়, ধর, −10°C-এ খানিকটা বরফ নেওয়া হল, তারও একটা বাষ্পচাপ থাকবে এবং বরফ ও বাষ্প একটা সাম্যাবস্থায় থাকবে। এখন এর সঙ্গে যদি খানিকটা জল মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেটা জমে বরফ হয়ে যাবে, কারণ এই উষ্ণতায় জলের বাষ্পচাপ বরফের চেয়ে বেশী। দেখা যাচ্ছে, উচ্চতর উষ্ণতায় জল ও বাষ্প সাম্যাবস্থায় থাকে আর নিম্নতর উষ্ণতায় বরফ ও বাষ্পের সাম্য দেখা যায়। একটি মাত্র বিশেষ চাপ ও উষ্ণতায় জল, বাষ্প ও বরফ এই তিনটিই একত্র সাম্যাবস্থায় থাকতে পারে, সেই অবস্থার চাপ 4·58 মিমি আর তাপমাত্রা 0·0075°C। একে বলে বরফ-জল-বাষ্পের "ত্রৈধ বিন্দু" (triple point)।

সাধারণ অবস্থায় জল জমে গিয়ে যে বরফ হয় তাকে বলা হয় "বরফ I" (Ice I)। তার কারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় আরও বিভিন্ন রকমের বরফের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। তাপমাত্রা কমিয়ে কমিয়ে যদি −22°C-এ যাওয়া যায় আর তার উপরে চাপ প্রয়োগ করা হয় প্রতি বর্গ সেন্টিতে 3500 কিলোগ্রাম, তা হলে বরফ II-এর সন্ধান পাওয়া

যায়। বরফ I এবং বরফ II-এর স্ফটিকাকার এক নয়, এবং ভৌতধর্মগুলিরও কিছু পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং তাদের বিভিন্ন ধরা হয়। এইভাবে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করে বিভিন্ন তাপমাত্রায় মোট সাত রকমের বরফ পাওয়া গেছে। এগুলো সবই স্ফটিকাকার জল বটে, কিন্তু এদের ভৌতধর্ম, যেমন, তাপগ্রাহিতা, লীনতাপ, গলনাঙ্ক, প্রভৃতি বিভিন্ন। বরফ I থেকে বরফ VII—এই সাত রকমের বরফ অবশ্য উপযুক্ত



চিত্র ৩০। বিভিন্ন উষ্ণতায় নানা রকমের বরফ

চাপে বিভিন্ন তাপমাত্রার সীমাতে থাকতে পারে। এমন কি 100°C-তাপমাত্রাতেও (যেখানে এক অ্যাটমসফিয়ারে জল ফুটতে থাকে) বরফ VII পাওয়া যায়, যদি উপরের চাপটি 30,000 কিলোগ্রাম রাখা যায়। হঠাৎ শুনলে ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু এটা পরীক্ষিত সত্য। কি রকম চাপে কোন বরফ পাওয়া যাবে তার একটা ধারণা চিত্র ৩০ থেকে পাওয়া যাবে।

এক গ্রাম জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়াতে যে তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে আমরা এক "ক্যালোরি" উত্তাপ বলি। এটাই তাপশক্তির একক। এই তাপশক্তি নির্ণয়ের মাপকাঠিটিও জলের ভিত্তিতেই স্থির করা হয়েছে। জল যখন ফুটতে থাকে তখন তার তাপমাত্রা স্থির থাকে, কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু এভাবে বাষ্পীভূত হতে নিশ্চয়ই তাপের প্রয়োজন হয়। বাষ্পীভবনের জন্য তরল যে তাপ গ্রহণ করে তাকে বলে "লীনতাপ" (latent heat)। 100°C-এ এক গ্রাম জলের বাষ্পীভবনে প্রায় 540 ক্যালোরি তাপ দরকার হয়, তাই জলের বাষ্পায়নের লীনতাপ 540 ক্যালোরি।

এই পরিমাণটা অন্যান্য সদৃশ তরলের তুলনায় খুবই বেশী। কেন বেশী সেটা আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব। আবার জল যখন জমে বরফ হয় তখন জল থেকে তাপ বেরিয়ে আসে, অর্থাৎ হিমীভবনেরও লীনতাপ আছে। একগ্রাম জল বরফ হওয়ার সময় প্রায় 80 ক্যালোরি তাপ ছেড়ে দেয়।

জলের আর একটি স্বভাবের কথা আগেই বলেছি, জলের তাপধারণ ক্ষমতা সর্বাধিক। তাপ ধরে রাখার এবং গ্রহণ করার ক্ষমতা বেশী বলেই সমুদ্রজল বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু, এমন কি, পৃথিবীর তাপমাত্রাকেও অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

অনেক তরল পদার্থ আছে, যাদের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না, যেমন, কেরোসিন, বেন্‌জিন ইত্যাদি। এগুলি বিদ্যুৎ-অপরিবাহী। কিন্তু বিদ্যুৎ-প্রবাহ ভিতর দিয়ে যেতে পারে এরকম তরলও আছে, যেমন. অ্যাসিড, ক্ষার বা লবণের দ্রবণ। এরা বিদ্যুৎ-পরিবাহী। বিশুদ্ধ জল বিদ্যুৎ-পরিবহণে কিছুটা সক্ষম। যখন কোন অণু পরাবিদ্যুৎবাহী এবং অপরাবিদ্যুৎবাহী কণাতে ভেঙে যায় তখন আমরা বলি সেটা আয়নিত হয়েছে। আয়ননের ফলে পরাবিদ্যুৎবাহী ক্যাটায়ন (+) এবং অপরাবিদ্যুৎবাহী অ্যানায়নের (−) সৃষ্টি হয়। এইরূপ আয়নিত হলেই পদার্থ বিদ্যুৎবহন করতে পারে। জলও সামান্য আয়নিত হয়; জলের অণুগুলির অতি সামান্য অংশ ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন ক্যাটায়ন (H^+) এবং হাইড্রক্সিল অ্যানায়ন (OH^-) সৃষ্টি করে, তাই জল সামান্য বিদ্যুৎ-পরিবাহী।

$$H_2O \rightarrow H^+ + OH^-$$

পরীক্ষায় দেখা গেছে, সাধারণ উষ্ণতায় প্রতি এক কোটি অণুর মধ্যে একটি অণু মাত্র এভাবে বিয়োজিত হয়। এক টন জলে মোটামুটি 0·1 মিলিগ্রাম H^+ আয়ন এবং 1·7 মিলিগ্রাম OH^- আয়ন আছে। আয়ন এত কম বলেই এর তড়িদ্বাহিতা কম। আবার যে সব যৌগ তরল অবস্থায় বিদ্যুৎ বহন করে সেগুলি বিদ্যুৎ-পরিচালনার ফলে বিভাজিত হয়ে পড়ে। জলের ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করলে জলের অণুগুলো বিভক্ত হয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস দেয়; $2H_2O = 2H_2 + O_2$।

জল থেকে এভাবে এক গ্রাম হাইড্রোজেন পেতে হলে যে তড়িৎ প্রয়োজন হয় তার পরিমাণ হচ্ছে 96500 কুলম্ব (কুলম্ব, তড়িতের একক)।

৯। জলের রসায়ন

"ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম"—এই পাঁচটি আদি পদার্থ থেকেই সমস্ত বস্তু জগতের সৃষ্টি—এ বিশ্বাস বহুকালের। অপ্ অর্থাৎ জলকে আদি পদার্থ কয়টির অন্যতম বলে মনে করা হত। এমন কি আড়াইশ বছর আগেও মানুষের এই ধারণাই

ছিল। কিন্তু তারপর এল বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। তখন দেখা গেল, সেই বহুদিনের ধারণাটা একেবারেই ভুল। ক্ষিতি বা মাটি নানা বস্তুর মিশ্রণ ; তেজ মোটে পদার্থই নয়, এক শক্তিবিশেষ ; মরুৎ বা বায়ু হচ্ছে একাধিক গ্যাসের মিশ্রণ ; ব্যোম হচ্ছে শূন্য বা বস্তুরহিত অবস্থা, যাকে বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে নাম দেন "ইথর"। জলও মৌলিক উপাদান নয়, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই দুটি গ্যাসের মিলনের ফলে জলের সৃষ্টি। 1766 সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিস হাইড্রোজেন গ্যাসের সন্ধান পান। তারপরে 1774 সালে আর এক ইংরেজ বিজ্ঞানী যোসেফ প্রিস্টলী অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করেন। 1781 সালে প্রিস্টলী দেখতে পেলেন, একটি আবদ্ধ পাত্রে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিশিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে প্রচন্ড শব্দ করে এক বিস্ফোরণ ঘটে এবং পাত্রের গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমে। প্রায় একই সময়ে ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ের অক্সিজেনের ভিতরে হাইড্রোজেন গ্যাসের একটি সরুপ্রবাহ প্রজ্বালিত করে জল উৎপাদন করেন। বোঝা গেল, জল মৌল পদার্থ নয়। নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হল, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলন থেকে জলের সৃষ্টি। আরও প্রমাণ উপস্থিত করলেন ল্যাভয়সিয়ের। উত্তপ্ত লৌহচুরের উপর দিয়ে জলবাষ্প পরিচালনা করে দেখা গেল, হাইড্রোজেন গ্যাস বেরিয়ে আসছে আর লৌহচুর আয়রন-অক্সাইডে পরিণত হয়েছে। লোহাকে অক্সিজেনে খুব উত্তপ্ত করলেও সেই আয়রন-অক্সাইডই পাওয়া যায়। অতএব জলবাষ্পের পরীক্ষাতে, জলের অক্সিজেন লৌহের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস বিযুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসছে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় জলের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পরিচালনা করেও ভোলটা, নিকল-সন, ডেভি প্রভৃতি অনেকেই জলকে বিশ্লেষিত করে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস সংগ্রহ করেন। এই সব পরীক্ষা থেকে নিশ্চিতভাবে জানা গেল, আয়তনের হিসাবে দুইভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন গ্যাসের সংযোগে দুইভাগ জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়।

জলে আছে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন, যেমন বাতাসে আছে নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন। কিন্তু এই দুইয়ের থাকার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বাতাসে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন শুধু সাধারণভাবে মিশে রয়েছে। এই দুটি গ্যাস সেখানে নিজ নিজ সত্তা বজায় রেখেছে, তাদের নিজেদের ধর্ম বা স্বভাব লোপ পায় নি। তা ছাড়া এরকম মিশ্রণে উপাদান দুটি যে কোন অনুপাতে মিশে থাকতে পারে। কিন্তু জলে যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন রয়েছে, সেগুলো সাধারণভাবে মিশে নেই, উভয়ের মধ্যে এক রাসায়নিক মিলন হয়ে সম্পূর্ণ নতুন পদার্থ জলে পরিণত হয়েছে। এরকম মিলনে উপাদান দুইটির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম লোপ পেয়েছে। হাইড্রোজেন একটি দাহ্য গাস ; অক্সিজেনও গ্যাস, কিন্তু দাহ্য নয়, সেটি দহন-সহায়ক। জল একটি স্বচ্ছ তরল, দাহ্যও নয়, দহন-সহায়কও নয়। অর্থাৎ, মিলনের ফলে নতুন পদার্থ নতুন ধর্ম নিয়ে উৎপন্ন হয়েছে। শুধু তাই নয়, জলে এই দুটি উপাদানের অনুপাত স্থির এবং নির্দিষ্ট, কখনও সেই অনুপাতের ব্যতিক্রম হতে পারে না। প্রায় পনের বছর ধরে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সুনিপুণ পরীক্ষা করে মর্লি (Morley, 1880~1895) প্রমাণ

করেছেন, ওজনের হিসাবে জলে একভাগ হাইড়োজেনের সঙ্গে প্রায় আটভাগ অক্সিজেন মিলিত হয়ে আছে।

অনুপাত	আয়তনে	ওজনে
$H_2 : O_2$	2 : 1	2·016 : 16·000

এই অনুপাতের কমবেশী হওয়া সম্ভব নয়, কোলকাতা বা কিলিমাঞ্জারো, হাভানা বা হনলুলু যেখানেই গিয়ে জল পরীক্ষা করা হোক, সেই একই অনুপাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকবে। এই উপাদান দুইটির মধ্যে অক্সিজেনের কথা বাতাসের প্রসঙ্গে* বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এখানে হাইড্রোজেনের বৈশিষ্ট্যের কিছুটা উল্লেখ করা হল।

হাইড্রোজেন

হাইড্রোজেন একটি বর্ণহীন গন্ধহীন গ্যাস। হাইড্রোজেনের কথা মনে হলে সহরের রাস্তায় রাস্তায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ফেরিওয়ালার কাছ থেকে বেলুনে যে গ্যাস ভরে আকাশে উড়িয়ে দেয়, সেই ছবিটাই চোখের সামনে ভেসে আসে। বেলুনে হাইড্রোজেন ভরতি করে ছেড়ে দিলে সেটা তরতর করে উপরে উঠে যায়, তার কারণ হাইড্রোজেন গ্যাস খুবই হালকা। বস্তুতঃ পৃথিবীর লঘুতম পদার্থ এই হাইড্রোজেন। জলের ঘনত্ব ধরা হয়েছে এক, অর্থাৎ এক সিসি জলের ওজন এক গ্রাম। সেখানে এক সিসি হাইড্রোজেনে গ্যাসের ওজন মাত্র 0·000089 গ্রাম। এমন কি বাতাস, যাকে আমরা খুব হালকা মনে করি, সেটাও হাইড্রোজেনের চেয়ে সাড়ে চৌদ্দ গুণ ভারী। এক সময়ে উড়োজাহাজের ভার লাঘবের জন্য হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহার হত। কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাস অত্যন্ত দাহ্য, সহজে আগুন ধরে যায়। তাই এখন হাইড্রোজেনের বদলে অদাহ্য হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করা হয়। হিলিয়াম হাইড্রোজেন অপেক্ষা দ্বিগুণ ভারী, কিন্তু বাতাসের চেয়ে অনেক হালকা। আবহ বিভাগে বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরের সংবাদ সংগ্রহ করে আনার জন্য প্রতিদিন বড় বড় অনেক বেলুন হাইড্রোজেন গ্যাস ভরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

হাইড্রোজেন জ্বলার সময় অক্সিজেনের সঙ্গে মিলে জল উৎপাদন করে। এই দহনের সময় প্রভূত তাপের সৃষ্টি হয়। প্রতি গ্রাম জল তৈরী হবার সময় 3800 ক্যালোরি তাপ বেরিয়ে আসে, সুতরাং জ্বলন্ত শিখার উষ্ণতা হয় খুব বেশী, 3000°C-এর উপরে। তড়িৎবাহী দুইটি টানস্টেন শলাকা কাছাকাছি নিয়ে এলে তাদের মধ্যে খুব জোরালো তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়। সেই স্ফুলিঙ্গের মধ্য দিয়ে যদি সরু নলে

* বাতাসের কথা পৃঃ ২৬

হাইড্রোজেন পাঠানো হয়, তবে সেখানে পারমাণবিক হাইড্রোজেন জ্বলতে থাকে ; তখন শিখার উষ্ণতা হয় প্রায় 4000°C-এর কাছাকাছি। এই শিখার সাহায্যে অনেক কঠিন ধাতু যেমন নিকেল, প্লাটিনাম প্রভৃতি গলানো যায়।

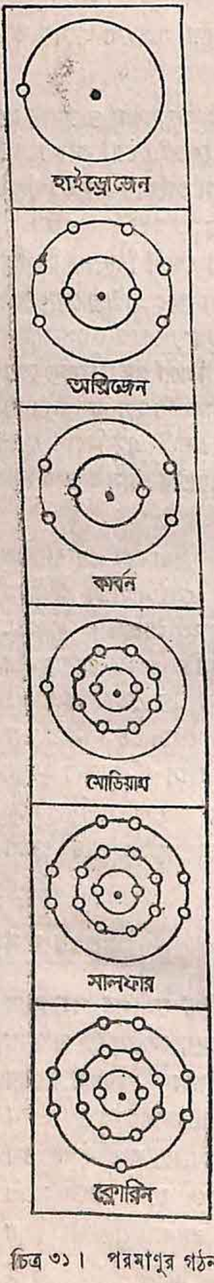
অ্যাসিড-মাত্রই হাইড্রোজেন-ঘটিত পদার্থ। অল্পস্বল্প হাইড্রোজেন প্রয়োজন হলে আমরা তা লঘু সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে তৈরী করি। এই অ্যাসিডের মধ্যে দস্তা বা লোহ দিলে তৎক্ষণাৎ হাইড্রোজেন গ্যাস বেরিয়ে আসে। কিন্তু যখন প্রচুর হাইড্রোজেন প্রয়োজন হয় তখন আরও সস্তায় প্রস্তুত করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে সর্বদাই জল থেকে হাইড্রোজেন তৈরী করা হয়। যেসব দেশে বিদ্যুৎশক্তি প্রচুর পরিমাণে সহজে পাওয়া যায়, সেখানে জলের তড়িদ্-বিশ্লেষণ করে হাইড্রোজেন তৈরী হয়। বিদ্যুৎ সহজলভ্য না হলে উত্তপ্ত লৌহচুর অথবা শ্বেততপ্ত কোক কয়লার উপর দিয়ে জলীয় বাষ্প পরিচালিত করা হয়। এর ফলে জল ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন দেয়। উত্তপ্ত কোকের উপর দিয়ে জলবাষ্প প্রবাহের ফলে যে গ্যাস পাওয়া যায় তার নাম "ওয়াটার গ্যাস"—এতে থাকে কার্বন-মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন। এই মিশ্রণ থেকে কার্বন-মনোক্সাইডকে সরিয়ে নিয়ে হাইড্রোজেন তৈরী হয়। ওয়াটার গ্যাস অনেক সময় গ্যাসীয় জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

হাইড্রোজেনের প্রচুর চাহিদা নানা শিল্পে এর প্রয়োজন। প্রধানতঃ এর ব্যবহার আমোনিয়া তৈরী করার জন্য। অ্যামোনিয়া দিয়েই অনেক সার এবং নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করতে হয়। তাই অ্যামোনিয়ার তথা হাইড্রোজেনের খুবই গুরুত্ব। এছাড়া, কৃত্রিম পেট্রোল, মিথাইল কোহল, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইত্যাদি একান্ত প্রয়োজনীয় অনেক পদার্থ তৈরী করার জন্যও হাইড্রোজেন চাই, বনস্পতি ঘি তৈরী করতেও হাইড্রোজেন দরকার হয়। তুলাবীজের তেল এবং আরও কোন কোন তেল নিয়ে তার সঙ্গে নিকেল-চূর্ণ মিশিয়ে সামান্য গরম অবস্থায় হাইড্রোজেন গ্যাস পরিচালনা করলে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তেল ঘিতে পরিণত হয়। এরপর অনুঘটক নিকেলকে আলাদা করে নেওয়া হয়। এরকম কৃত্রিম ঘিয়ের কারখানা আজকাল আমাদের দেশে প্রচুর হয়েছে।

জলের অণু

হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে জল, অর্থাৎ এই দুইটি মৌলের পরমাণুর সংযোগে জলের অণু গঠিত। বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন জলের প্রতিটি অণুতে রয়েছে দুটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু। তাই জলের সংকেত লেখা হয়, H_2O। অণুগুলো অতি ক্ষুদ্র ; একটি জলের অণুর ওজন 3×10^{-23} গ্রাম আর তার ব্যাস মোটামুটি 2×10^{-8} সেন্টিমিটার, অর্থাৎ আয়তন প্রায় 4×10^{-24} সিসি, এত ছোট যে কোন অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীর হাতে নিস্তার নেই। বিজ্ঞানীরা যে শুধু আকার-আয়তন স্থির করেছেন তাই নয়, অণুর ভিতরের পরমাণু তিনটির প্রতিবিন্যাস পর্যন্ত বের করেছেন।

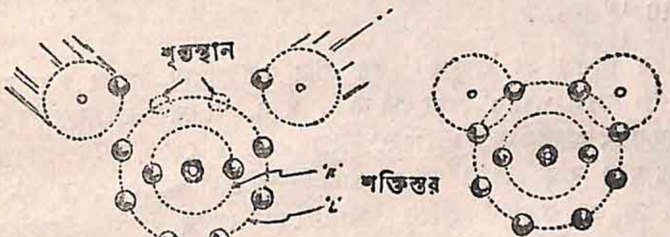
এখন প্রত্যেকেই জানেন, সমস্ত পরমাণুই তিন রকমের আদিকণা নিউট্রন, প্রোটন এবং ইলেকট্রন দিয়ে গঠিত। নিউট্রন ও প্রোটন কণাগুলি ওজনে সমান, কিন্তু নিউট্রনের কোন তড়িৎ-মাত্রা নেই, প্রোটনে একটি পজিটিভ বা পরাধর্মী তড়িৎমাত্রা আছে। অপরদিকে ইলেকট্রন কণাগুলির ওজন প্রোটনের তুলনায় নগণ্য। কিন্তু প্রতি ইলেকট্রনে এক মাত্রার নেগেটিভ তড়িৎ-আধান রয়েছে। ইলেকট্রনে যে পরিমাণ তড়িৎ রয়েছে তাকেই এখানে তড়িতের একক ধরা হচ্ছে। সুতরাং ইলেকট্রন ও প্রোটনের তড়িৎ-আধান সমান কিন্তু বিপরীত-ধর্মী। ইলেকট্রনের আধানের পরিমাণ বস্তুতঃ $1{\cdot}6 \times 10^{-19}$ কুলম্ব।



চিত্র ৩১। পরমাণুর গঠন

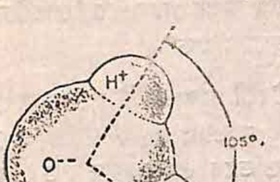
প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রে তার প্রোটন ও নিউট্রনগুলি একত্র পুঞ্জিত হয়ে থাকে। আর ইলেকট্রনগুলি এই কেন্দ্রের চারদিকে বিভিন্ন চক্রাকার পথে সর্বদা খুব দ্রুত ঘুরতে থাকে। কেন্দ্রের প্রোটনের সংখ্যা এবং কেন্দ্রের বাইরের ইলেকট্রন সংখ্যা সমান। কেন্দ্রটি পরাধর্মী (পজিটিভ) আর বাইরের ইলেকট্রন স্তর অপরাধর্মী (নেগেটিভ)। সম্পূর্ণ পরমাণু তড়িৎ-নিরপেক্ষ (neutral)। এখানে হাইড্রোজেন অক্সিজেন, কার্বন, সোডিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি পরমাণুর গঠন-চিত্র দেওয়া হল (চিত্র ৩১)। কেন্দ্রের প্রোটন সংখ্যাকে বলা হয়, "পরমাণু-ক্রমাঙ্ক"। মৌলের বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব এই ক্রমাঙ্কের উপর নির্ভর করে। কিন্তু রাসায়নিক মিলনে যখন দুইটি বা ততোধিক পরমাণুর সংযোগ ঘটে তখন ঐসব পরমাণুর বাইরের শেষ স্তরে যে সব ইলেকট্রন থাকে তারাই সংযোগে অংশ গ্রহণ করে। বিভিন্ন পরমাণুর বাইরের স্তরের ইলেকট্রনগুলি হয় একত্রিত সন্নিবিষ্ট হতে চেষ্টা করে, অথবা তাদের মধ্যে ইলেকট্রনের আদান প্রদান ঘটে, এই রকম সংযোগের একটা রীতি আছে। পরমাণুগুলি সাধারণতঃ এমনভাবে ইলেকট্রন সমাবেশ করে বা দেওয়া-নেওয়া করে, যাতে মিলিত অবস্থায় পরমাণুর বাইরের স্তরে আটটি ইলেকট্রন থাকে। যেমন, অক্সিজেন পরমাণুতে বাইরের স্তরে আছে ছয়টি ইলেকট্রন। সুতরাং মিলিত হওয়ার সময় অক্সিজেন পরমাণু তার বাইরের স্তরে আটটি ইলেকট্রন পাবার জন্য অন্য অংশগ্রহণকারী পরমাণু থেকে দুইটি ইলেকট্রন সংগ্রহ করে। সচরাচর এই নিয়মেই বন্ধন ঘটে।

প্রত্যেক হাইড্রোজেন পরমাণুর রয়েছে—কেন্দ্রে একটি প্রোটন আর তার বাইরে একটি ইলেকট্রন। অক্সিজেন পরমাণু যখন হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কাছ থেকে দুটি ইলেকট্রন নিজের কোলে টেনে নেয়। এর ফলে, অক্সিজেনের বাইরের স্তরে আটটি ইলেকট্রন পূর্ণ হল, আর দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে জলের অণুর সৃষ্টি হল। ইলেকট্রন হারিয়ে হাইড্রোজেনের কেন্দ্রস্থ প্রোটন দুইটি অক্সিজেনের পরমাণুর বাইরে সংলগ্ন হয়ে রইল। ছবিতে ধারণাটা আরও স্পষ্ট হবে (চিত্র ৩২, ৩৩)।



চিত্র ৩২। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর সংযোগে জলের অণুর গঠন।

আরও প্রমাণিত হয়েছে, এই হাইড্রোজেন পরমাণু দুটি অক্সিজেন পরমাণুর দুই বিপরীত দিকে সোজাসুজি ঋজুরেখাতে নেই, অর্থাৎ পরমাণু তিনটির প্রতিবিন্যাস H–O–H এরকম নয়। হাইড্রোজেন পরমাণু দুটি অক্সিজেন পরমাণুর দুইপাশে একটি কোণ সৃষ্টি করে রয়েছে। এই কোণের পরিমাণ 105° এবং অক্সিজেন কেন্দ্র থেকে প্রত্যেকটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রের দূরত্ব $0{\cdot}96 \times 10^{-8}$ সেণ্টিমিটার।

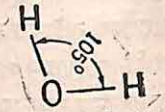


চিত্র ৩৩। জলের অণু

জলের অণুর তিনটি পরমাণুর তিনটি কেন্দ্রে তিনটি পজিটিভ বা পরাধর্মী আধান রয়েছে, আর এছাড়া দশটি ইলেকট্রন চারিদিকে প্রদক্ষিণরত রয়েছে। এই পজিটিভ আধানগুলির ক্রিয়া-কেন্দ্র (centroid) এবং নেগেটিভ ইলেকট্রনগুলির ক্রিয়া-কেন্দ্র অণুর ভিতরে ঠিক একই বিন্দুতে নয়। ক্রিয়া-কেন্দ্র দুইটি পরস্পর থেকে খানিকটা দূরে। ফল কথা, অণুটির মধ্যে একটি পজিটিভ কেন্দ্র এবং একটি নেগেটিভ কেন্দ্র রয়েছে। এরকম অণুকে বলে "ধ্রুবীয় অণু" (Polar molecule)। কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) অণুতেও তিনটি পরমাণু রয়েছে, একটি কার্বনের ও দুইটি অক্সিজেনের। কিন্তু সেখানে অক্সিজেন দুটি কার্বনের দুদিকে সরল ঋজুরেখায়

সমদূরে রয়েছে। এই জন্য এই অণুতে কেন্দ্র তিনটির এবং ইলেকট্রনগুলির ক্রিয়াকেন্দ্র একই বিন্দুতে পড়ে। জলের অণুতে তা হয় না।

O=C=O



চিত্র ৩৪
CO_2 ও H_2O অণুর সংরচনা

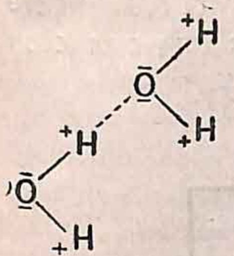
সুতরাং জল ধ্রুবীয় অণু আর কার্বন-ডাইঅক্সাইড অধ্রুবীয় অণু। জলের এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ কেন্দ্র দুইটির মধ্যে একটা মোমেণ্টের উদ্ভব হয়, যাকে বলে "ডাইপোল মোমেণ্ট" (dipole moment)। প্রত্যেক ধ্রুবীয় অণুর ডাইপোল মোমেণ্ট থাকে। জলের ডাইপোল মোমেণ্ট হচ্ছে $1{\cdot}8 \times 10^{-18}$ esu.

জলের প্রকৃতি বড় অদ্ভুত। এর এমন কতকগুলো বিশেষ গুণ রয়েছে যা অন্য কোন তরল পদার্থে দেখা যায় না। যেমন, জল যখন জমে বরফ হয় তখন এর ঘনত্ব যায় কমে, আয়তন বাড়ে। কিন্তু সাধারণতঃ তরল থেকে কঠিন অবস্থায় গেলে পদার্থের ঘনত্ব বাড়ে, জলের বেলায় তার বিপরীত। জলের অণুর গঠনের কথা মনে রাখলে এর কারণটি বুঝতে পারা যাবে। জলের অণুর বহিঃপ্রান্তে আছে ইলেকট্রন-বিমুক্ত হইড্রোজেনের নগ্ন প্রায় দু'টি ধনাত্মক (positive) প্রোটন, H^+। জলের অণুর এই দু টি হাইড্রোজেন পরমাণু তাদের ইলেকট্রন অক্সিজেনকে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের ইলেকট্রন-তৃষ্ণা রয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে যদি কাছাকাছি অন্য কোন ছোট অপরাধর্মী পরমাণুতে একজোড়া অনাবদ্ধ (free) ইলেকট্রন থাকে তাহলে জলের এই প্রোটন সেই যুগ্ম ইলেকট্রনকে টেনে আনে। বিশেষ করে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন বা ফ্লুরিন পরমাণুর ওইরকম যুগ্ম ইলেকট্রনের সঙ্গে এই প্রোটন স্বতঃই সংগুণিত (associated) হয়। প্রোটনের এটা একটা বিশেষ ক্ষমতা এই আকর্ষণের ফলে জলের অণুর প্রোটনের সঙ্গে অপর পরমাণুর ইলেকট্রনের একটা যোজক বা বন্ধন রচিত হয়। একে বলে "হাইড্রোজেন বণ্ড"।

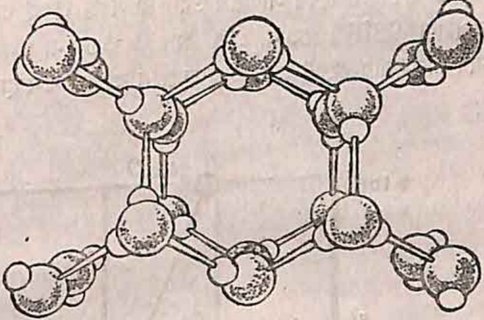
এখন জলের অণুতে প্রোটন রয়েছে আর তার নিকটবর্তী আর একটি জলের অণুর অক্সিজেন পরমাণুতে অনাবদ্ধ ইলেকট্রন-যুগল রয়েছে। সুতরাং একটি জলের অণুর প্রোটন তার পার্শ্ববর্তী অণুর অক্সিজেনের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাইড্রোজেন বণ্ড তৈরী করবে। এর ফলে দুইটি জলের অণু সংগুণিত হয়ে পড়বে (চিত্র ৩৫)। সংগুণিত দ্ব্যণুতে প্রোটন রয়েছে, সুতরাং সেটা আরও জলের অণুর অক্সিজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন বণ্ড সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ সংগুণন দু'টি অণুতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

প্রত্যেকটি জলের অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে। সেই দুইটি অপর দুইটি জলের অণুর সঙ্গে হাই ড্রাজেন বণ্ড দিয়ে জুড়ে যাবে। আবার সেই অণুগুলির হাই ড্রাজেনও আরও জলের অণুর সঙ্গে একই রকমে হাইড্রোজেন বণ্ড দিয়ে জুড়ে যেতে থাকবে। এমনি বহুসংযোগের (polymerisation) ফলে অনেকগুলো করে জলের অণু একত্র পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। অর্থাৎ জলের অণু সচরাচর একক থাকে না। জল

যখন জমে বরফ হয় তখনও অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন থাকে এবং এদের মাধ্যমেই বরফের কেলাস গঠিত হয় (চিত্র ৩৬)। এই পরিবিন্যাসের ফলে কেলাসের অভ্যন্তরে অনেকটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তাই জলের অণুগুলো কেলাসিত হওয়ার সময় অনেকটা স্থান জুড়ে থাকে। এই কারণেই বরফের আয়তন বেশী এবং



চিত্র ৩৫। জলের দুইটি অণু হাইড্রোজেন বণ্ড দ্বারা যুক্ত।



চিত্র ৩৬। বরফের কেলাসে হাইড্রোজেন বণ্ড

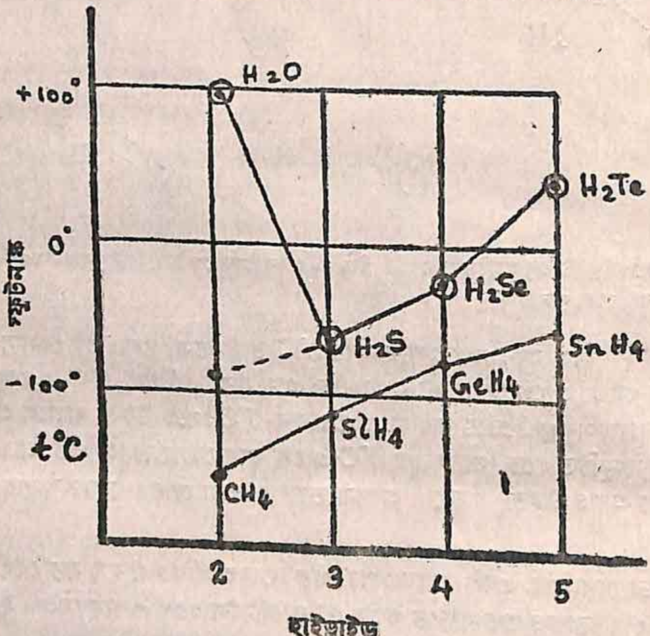
ঘনত্ব কম হয়। বরফ যখন গলতে শুরু করে 0°C তাপমাত্রায়, তখন এই কেলাস-সজ্জা লোপ পেতে থাকে, অণুগুলো তখন কাছাকাছি এসে যায়। কিন্তু 0°C-এ কেলাসের গঠনটা একেবারে সম্পূর্ণ ভেঙে যায় না। সেইজন্য 0°C-থেকে উষ্ণতা বাড়ালে আয়তন আরও কিছু সংকুচিত হতে থাকে এবং 4°C-এ পেঁছিলে কেলাসের আকৃতি আর থাকে না। এরপর আরও উষ্ণতা বাড়ালে অন্যান্য তরলের মতো জলের ঘনত্বও কমতে থাকে (চিত্র ২৯)।

সাধারণতঃ দেখা যায়, একই ধরনের পদার্থের মধ্যে আণবিক গুরুত্ব যত বেশী হয় স্ফুটনাঙ্ক এবং গলনাঙ্কও তত বাড়তে থাকে। দুইটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল।

পদার্থ	আঃ গুরুত্ব	গলনাঙ্ক (°K)	পদার্থ	আঃ গুরুত্ব	স্ফুটনাঙ্ক (°C)
হিলিয়াম	4	0·9°	CH_4	16	−161·3°
নিয়ন	20·18	24·43°	SiH_4	32	−111·9°
আরগন	40	83 9°	GeH_4	76·6	−90°
ক্রিপটন	83·8	104°	SnH_4	122·7	−52°
জিনন	131·3	133°			

এখন জল (H_2O) যে শ্রেণীর অন্তর্গত সেখানে চারটি হাইড্রাইড আছে : H_2O (18), H_2S (34), H_2Se (160), H_2Te (257)। এখানে আপেক্ষিক গুরুত্ব যত কমবে গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্কও তত কমবে। সেই হিসাবে জলের গলনাঙ্ক হওয়া উচিত

—100°C এবং স্ফুটনাঙ্ক —80°C। কিন্তু বস্তুতঃ জলের গলনাঙ্ক তার চেয়ে একশ ডিগ্রি উপরে আর স্ফুটনাঙ্ক প্রায় একশ আশি ডিগ্রি উপরে (চিত্র ৩৭)। জলের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম সেই হাইড্রোজেন বণ্ড দ্বারা অণুগুলির সংগুণনের ফলে। অনেকগুলি অণু একত্র পুঞ্জীভূত থাকাতে লীনতাপের প্রয়োজন বেশী ; বরফ গলাতে তাপমাত্রা বেশী প্রয়োজন। স্ফুটনাঙ্কের উচ্চতাও সেই একই কারণে। যদি জলে এই হাইড্রোজেন বণ্ড না থাকত তবে আমাদের সাধারণ উষ্ণতায় সমস্ত জলই বাষ্পীভূত হয়ে যেত। শরীরেও (তাপমাত্রা 98°F) কোন জল আর থাকত না। জীবজগৎ লোপ পেয়ে যেত। বিশ্বকর্মা হিসাব করেই জলে হাইড্রোজেন বণ্ডের ব্যবস্থা করতে ভোলেন নি।

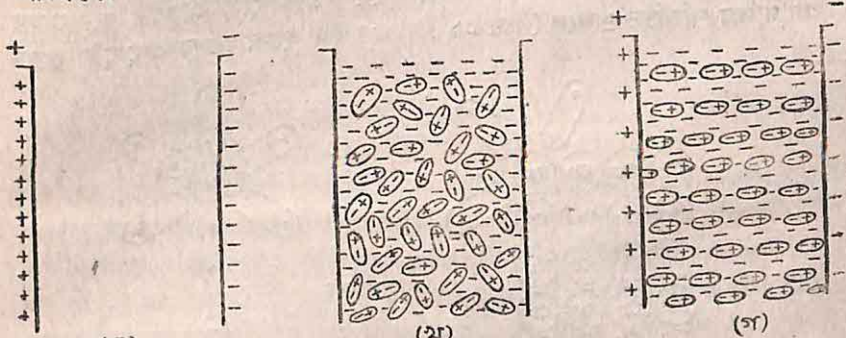


চিত্র ৩৭

জলের আর একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে যেটা অন্য তরলের মধ্যে বড় দেখা যায় না। জলের দ্রাবণীশক্তি খুব বেশী। পেট্রল, কেরোসিন, কোহল, বেনজিন, ক্লোরোফর্ম, নারকেল তেল ইত্যাদি তরলে লবণজাতীয় পদার্থ দ্রবিত হয় না। কিন্তু জলে খাদ্যলবণ তো (NaCl) বটেই, অন্যান্য লবণও যেমন, সোরা ($NaNO_3$), তুঁতে ($CuSO_4$, $5H_2O$), নিশাদল, ফটকিরি, পটাস ক্লোরাইড ইত্যাদি, অধিকাংশ লবণই অনায়াসে দ্রব হয়। কেন এরকম হয় সেটা বুঝতে গেলে গোড়ার কথা একটু জানা দরকার।

দুইটি ধাতুর পাত সমান্তরাল করে বাতাসে রেখে যদি একটি ব্যাটারীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, তা হলে একটি পাত ধনাত্মক (পজিটিভ) এবং অপরটি ঋণাত্মক (নেগেটিভ)

তড়িতাহিত হবে (চিত্র ৩৮ ক)। এই পাত দুইটির মাঝখানে অবশ্য একটা তড়িৎ-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে। এই তড়িৎ-ক্ষেত্রের বল নির্ভর করবে পাতদুইটির তড়িৎ-বিভবের উপরে এবং মাঝখানে যে পদার্থ রয়েছে তার উপরে। এখানে মাধ্যম রয়েছে বাতাস। এখন বাতাসের পরিবর্তে যদি মাঝখানে জল থাকে তবে দেখা যাবে তড়িৎ-ক্ষেত্রের বল অনেক কমে গেছে। জলের অণুগুলি ধ্রুবীয়, অর্থাৎ জলের অণুগুলির পজিটিভ ও নেগেটিভ ক্রিয়া-কেন্দ্র রয়েছে। যদি ধাতুর পাত দুইটিতে কোন তড়িৎ-আধান না থাকত তবে এই অণুগুলি যেমন তেমন অবস্থায় থাকতে পারত (চিত্র ৩৮ খ)। কিন্তু যেহেতু ধাতুর পাত দুইটি তড়িতাহিত, সুতরাং ঐ তড়িৎ-ক্ষেত্রে জলের অণুগুলির নির্দিষ্ট অভিবিন্যাস হবেই। অণুগুলির পজিটিভ প্রান্ত ঋণাত্মক পাতের দিকে এবং নেগেটিভ প্রান্ত ধনাত্মক পাতের দিকে আকৃষ্ট হবে। এই জন্য সব অণুগুলি একটা বিশেষ ভাবে সজ্জিত হতে সচেষ্ট হবে (চিত্র ৩৮ গ)। এর ফলে জলের অণুগুলি থেকে পাত দুইটির উপর বিপরীত তড়িৎ আবিষ্ট হবে। সুতরাং পাত দুইটির কার্যকরী তড়িৎ-বিভবের হ্রাস ঘটবে এবং সেই হেতু মধ্যবর্তী মাধ্যমের ভিতরের তড়িৎ-ক্ষেত্রের বলও কমবে। অর্থাৎ ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক পাতের মধ্যে আকর্ষণের পরিমাণ কমে যাবে। অন্যান্য ধ্রুবীয় মাধ্যমে রাখলেও একরকম ফলই



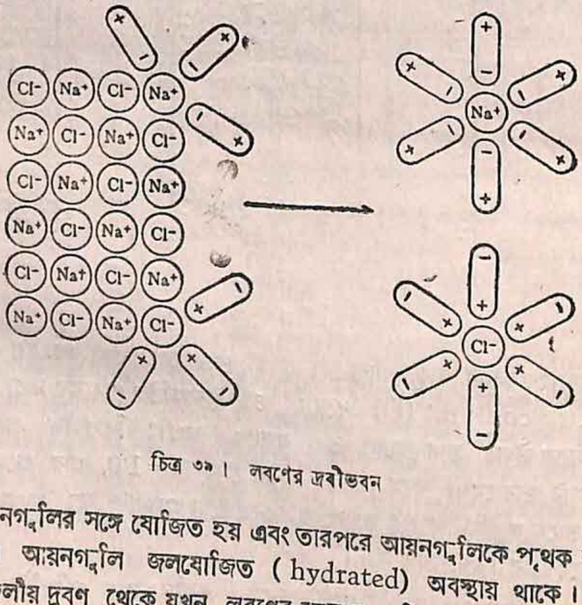
চিত্র। ৩৮

হবে। বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের উপরে মাধ্যমের এরকম প্রভাবকে প্রকাশ করা হয় বৈদ্যুত ধ্রুবক বা dielectrc constant (D) দিয়ে। ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবকের মাত্রা যত বেশী হবে বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের উপর তার প্রভাব তত বাড়বে, অর্থাৎ বিপরীত আধানের মধ্যে যে আকর্ষণ সেটা তত বেশী কমে যাবে। বাতাসের D=1·0, আর জলের D=80। অতএব বাতাসে দুইটি পাতের তড়িৎ-আধানের মধ্যে আকর্ষণ যত, জলে থাকলে সেই আকর্ষণ হবে তার 1/80 ভাগ মাত্র।

লবণের অণুগুলিতে দুইটি অংশ থাকে। একটি অংশে পজিটিভ বিদ্যুৎ-আধান এবং অপরটিতে নেগেটিভ বিদ্যুৎ-আধান থাকে। এই তড়িৎযুক্ত অংশগুলিকে নাম দেওয়া হয়েছে "আয়ন"। অতএব, লবণের অণু ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়ন দিয়ে গড়া। যেমন খাদ্য-লবণে (সোডিয়াম ক্লোরাইড, $NaCl$) আছে পজিটিভ সোডিয়াম

আয়ন (Na^{+}) আর নেগেটিভ ক্লোরাইড আয়ন (Cl^{-})। $NaCl \rightarrow Na^{+} + Cl^{-}$। সব লবণেই এরকম বিপরীতধর্মী আয়ন রয়েছে। বাতাসের মধ্যে লবণ যখন কঠিনাকারে থাকে তখন কেলাসের মধ্যে পজিটিভ ও নেগেটিভ আয়নগুলি পরপর সুনির্দিষ্ট উপায়ে সাজান থাকে। বিপরীত আধানের জন্য তাদের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ থাকে এবং আয়নগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এখন এই লবণকে যদি জলে দেওয়া হয়, তা হলে কেলাসের মধ্যস্থ সোডিয়াম আয়ন ও ক্লোরাইড আয়নের মধ্যে আকর্ষণ অনেক কমে যাবে, কারণ জলের ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবক খুব বেশী। আকর্ষণ হ্রাস পাওয়াতে দুই বিপরীত আয়ন তখন অনেক সহজে আলাদা হয়ে জলের মধ্যে বিসৃত হয়ে পড়ে। আমরা বলি, জলে লবণ দ্রবিত হল। জলের অণু ধ্রুবীয় না হলে এটা সম্ভব হত না। শুধু তাই নয়, ধ্রুবীয় অবস্থার জন্য জলের ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবকের মাত্রা বেশী। তার উপর হাইড্রোজেন বণ্ড দ্বারা অণুগুলি সংগুণিত হওয়ার জন্য সেই ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবকের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। তাই অত সহজে লবণ দ্রবিত হয়।

লবণের অনায়াসে দ্রবিত হওয়ার আর একটা কারণও রয়েছে। লবণের স্ফটিকে যে Na^{+} আয়নগুলি রয়েছে সেগুলো জলের ধ্রুবীয় অণুগুলির নেগেটিভ প্রান্তকে আকর্ষণ করে টেনে আনে। আবার লবণের Cl^{-} আয়নগুলি আকর্ষণ করে জলের অণুগুলির পজিটিভ প্রান্তকে (চিত্র ৩৯)। এর অর্থ হচ্ছে, জলের অণুগুলি প্রথমে



চিত্র ৩৯। লবণের দ্রবীভবন

কেলাসের আয়নগুলির সঙ্গে যোজিত হয় এবং তারপরে আয়নগুলিকে পৃথক করে দেয়। দ্রবিত অবস্থায় আয়নগুলি জলযোজিত (hydrated) অবস্থায় থাকে। এমনকি, অনেক সময় জলীয় দ্রবণ থেকে যখন লবণের কেলাস বেরিয়ে আসে, তখন আয়নগুলি সেই যোজিত জল নিয়েই কেলাসিত হয়। এসব কেলাসকে বলা হয় "সোদক স্ফটিক"। কোন কোন ক্ষেত্রে লবণের স্ফটিকাকার এবং স্ফটিকের বর্ণ এই যোজিত জলের জন্যেই

হয়ে থাকে। যেমন, নীলবর্ণের লবণ তুঁতের (কপার সালফেট, $CuSO_4, 5H_2O$) স্ফটিকে প্রতিটি কপার সালফেট অণুর সঙ্গে পাঁচটি জলের অণু থাকে। এই স্ফটিককে তাপিত করলে তার কেলাস-জল উবে যায়, স্ফটিকাকার লোপ পায় আর সাদা অনার্দ্র কপার সালফেট পড়ে থাকে। জলের জন্যই স্ফটিকের রঙ ও আকৃতি।

এর আগে আমরা দেখেছি জল সামান্য আয়নিত হয়ে H^+ এবং OH^- আয়নের সৃষ্টি করে ; $H_2O \rightarrow H^+ + OH^-$ । মোটামুটি ভাবে বলা যায় পদার্থ দ্রবিত অবস্থায় H^+ – আয়ন দেয়, সেগুলো অ্যাসিড বা অম্ল। আর যে সব পদার্থ থেকে দ্রবণে OH^- আয়নের উৎপত্তি হয় সেগুলো ক্ষারক। এখন জলে H^+ আয়ন OH^- আয়ন দুই-ই আছে এবং সমপরিমাণে আছে। সেইজন্য জল অম্লও নয়, ক্ষারকও নয় ; জল একটি প্রশম (neutral) পদার্থ। আপাতদৃষ্টিতে জলকে খুব নিরীহ মনে হয়। কিন্তু কোন কোন সময় এর তীব্র সক্রিয়তা বিস্ময়কর। শুকনো চুনের সঙ্গে জল মিশালে কি প্রচণ্ড তাপ উদ্‌গীরণ হয় তা সবারই জানা। তেমনি সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সংস্পর্শে জল এলেই তৎক্ষণাৎ ধাতুগুলি আক্রান্ত হয়ে কস্টিক ক্ষারে পরিণত হয়ে যায়। কারবাইড বাতিতে যে অ্যাসিটিলীন গ্যাস জ্বালিয়ে আলো উৎপাদন করা হয় সেটাও কারবাইডের উপরে জলের আক্রমণের ফলেই। এসব জলের বৈশিষ্ট্য।

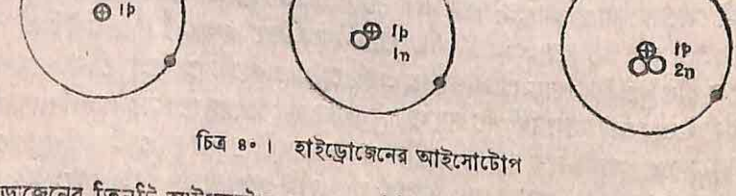
১০। ভারী জল

মৌলের ধর্ম তার পরমাণুগুলিরই ধর্ম। কোন একটি মৌলের সব পরমাণুগুলিই একই রকমের, সুতরাং তাদের ব্যবহার, গুণাগুণ একই হবে। আগে বিশ্বাস ছিল একটি মৌলের সমস্ত পরমাণুর ওজনও একই হবে। কিন্তু পরে পরীক্ষায় দেখা গেল তা নয়। অন্য দিক দিয়ে এক হলেও পরমাণুগুলির ওজন বিভিন্ন হতে পারে। পরমাণুগুলি খুব ছোট ওজনের বলে সাধারণতঃ তাকে গ্রামে মাপা হয় না। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনকে একক ধরে মোটামুটি অন্য পরমাণুর ওজন প্রকাশ করা হয়।* যেমন, একটি সালফার পরমাণুর ওজন 32, অর্থাৎ সালফারের পরমাণু মোটামুটি একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে 32 গুণ ভারী। মোটামুটি হিসাবে একটি নিউট্রন, একটি প্রোটন ও একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন প্রায় সমান। দেখা যায়, একই মৌলের সব পরমাণুর ওজন এক নয়। যেমন, ক্লোরিনের কতকগুলি পরমাণুর ওজন 35, অপরগুলির ওজন 37 (উপরের নির্দেশিত এককে)। প্রশ্ন উঠতে পারে, ওজনে যদি পার্থক্য থাকে তবে তাদের একই মৌলের পরমাণু বলে কেন ধরা হবে। মনে রাখতে হবে, মৌল চিহ্নিত হয় তার পরমাণুর কেন্দ্রের প্রোটন-সংখ্যা দিয়ে, অর্থাৎ ক্রমাঙ্ক দিয়ে, ওজন দিয়ে নয়। দুইটি পরমাণুর কেন্দ্রে যদি একই সংখ্যক প্রোটন থাকে তবে দুই রকম পরমাণুর স্বভাব, ধর্ম একই হবে, তারা একই মৌলের পরমাণু

* বাস্তবিক পারমাণবিক গুরুত্বের একক একটি কার্বন-পরমাণুর $\frac{1}{12}$ ওজন।

হবে। ক্লোরিনের দুইটি পরমাণুর ওজন বিভিন্ন হলেও প্রত্যেকটিরই কেন্দ্রে 17টি প্রোটন রয়েছে, প্রত্যেকেরই ক্রমাঙ্ক 17। সুতরাং তারা একই মৌলের। তাদের ওজন এবং ওজন-নির্ভর ধর্ম (যেমন, ঘনত্ব) ছাড়া সব রকম গুণ ও স্বভাব সম্পূর্ণ একরকম হবে। তবে ওজনের পার্থক্য কেন? আমরা জানি, পরমাণুর ওজন হচ্ছে তার কেন্দ্রের প্রোটন ও নিউট্রনের ওজন (ইলেকট্রনগুলির ওজন নগণ্য)। পরমাণুগুলির কেন্দ্রের প্রোটন সংখ্যা এক হলেও, নিউট্রনের সংখ্যা আলাদা হতে পারে। ফলে, পরমাণুর ওজন বিভিন্ন হয়। একই মৌলের বিভিন্ন ওজনের পরমাণুকে বলা হয় "আইসোটোপ"। কোন মৌলের আইসোটোপগুলির ওজন বিভিন্ন, কিন্তু ক্রমাঙ্ক অর্থাৎ প্রোটন-সংখ্যা একই। যেমন, অক্সিজেনের তিন রকম আইসোটোপ রয়েছে। প্রত্যেকেরই প্রোটন-সংখ্যা আট। অধিকাংশ অক্সিজেন পরমাণুরই কেন্দ্রে থাকে আটটি নিউট্রন; অল্প কিছু পরমাণুর কেন্দ্রে আবার দশটি নিউট্রন রয়েছে, আর অতি সামান্য কিছু পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নয়টি নিউট্রন। এদের আমরা লিখি, ^{16}O ^{17}O ^{18}O। বাঁদিকের উপরের সংখ্যাগুলি পরমাণুর বিভিন্ন ওজন নির্দেশক। মনে রাখা দরকার, প্রোটন ও নিউট্রনের ওজন প্রায় সমান এবং তাকে ওজনের একক বলে ধরা হয়েছে।

হাইড্রোজেনেরও আইসোটোপ আছে। হাইড্রোজেনের পরমাণু-কেন্দ্রে সচরাচর একটি মাত্র প্রোটন থাকে, কোন নিউট্রন নেই। কেন্দ্রটিকে একটি ইলেকট্রন প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং এর ওজন বা পরমাণবিক গুরুত্ব 1(এক)। 1932 সনে বিজ্ঞানী উরে আবিষ্কার করলেন, যে হাইড্রোজেনের সব পরমাণু এক নয়; কিছু পরমাণু রয়েছে, যাদের কেন্দ্রে একটি প্রোটনের সঙ্গে একটি নিউট্রনও রয়েছে। অতএব এই শেষোক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে দ্বিগুণ ভারী, কিন্তু প্রোটন-সংখ্যা উভয়েরই এক (1)। এই ভারী হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব 2। এই ভারী হাইড্রোজেনের জন্য একটি বিশেষ নাম গ্রহণ করা হয়েছে "ডয়টেরিয়াম" (Deuterium) এবং এর চিহ্ন "D"। পরবর্তীকালে আর এক রকম হাইড্রোজেনের পরমাণুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে একটি প্রোটনের সঙ্গে দুইটি নিউট্রন কেন্দ্রে রয়েছে, এর গুরুত্ব হবে 3 (চিত্র 8০)। এর নাম "ট্রাইটিয়াম" (Tritium, ^{3}T)। অর্থাৎ

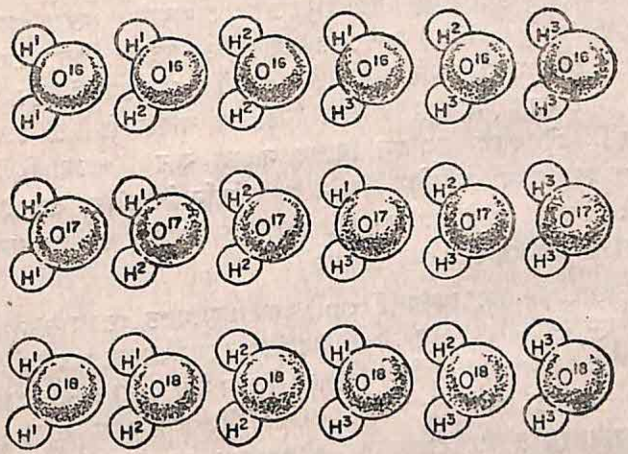


চিত্র ৪০। হাইড্রোজেনের আইসোটোপ

হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপ আছে। ট্রাইটিয়ামের পরিমাণ থাকে খুবই সামান্য; প্রতি 10^{17} হাইড্রোজেন (^{1}H) পরমাণুর মধ্যে একটি ^{3}T পরমাণু থাকে। অপর

দুইটির অনুপাত, হাইড্রোজেন ঃ ডয়টেরিয়াম $=99.984 : 0.016$। অর্থাৎ, প্রতি সাত হাজার সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে একটি ডয়টেরিয়াম থাকে।

হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সংযোগে জলের উৎপত্তি। একটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে দুইটি হাইড্রোজেনের পরমাণু মিলিত হয়ে জলের পরমাণু H_2O গঠিত। এখন দেখা যাচ্ছে, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন উভয়েরই তিনটি করে আইসোটোপ রয়েছে। অতএব বিভিন্ন ওজনের হাইড্রোজেন (^1H, ^2H, ^3H) পরমাণুর সঙ্গে বিভিন্ন ওজনের অক্সিজেন পরমাণু মিলে নানা ওজনের জলের অণু গড়তে পারে। অন্ততঃ আঠার রকমের জলের অণু পাওয়া সম্ভব (চিত্র ৪১)। যথা,



চিত্র ৪১। জলের বিভিন্ন ওজনের অনু

এতরকম অণুর মধ্যে যে জল আমরা ব্যবহার করি, তার মধ্যে প্রধানতঃ থাকে $^1H_2{}^{16}O$, প্রায় 99.9 শতাংশেরও বেশী। বাকীটুকু D_2O, অর্থাৎ $^2H_2{}^{16}O$। অন্যান্য অণুর অস্তিত্ব খুবই কম, নগণ্য মনে করা হয়। এই D_2O অর্থাৎ ভারী হাইড্রোজেন থেকে পাওয়া জলই হচ্ছে "ভারী জল"। সাধারণ জল থেকে ভারী জলকে এখন পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। দুই রকম জলের রাসায়নিক ধর্মগুলি অভিন্ন, কিন্তু গুরুত্বের পার্থক্য-হেতু ভৌত ধর্মের কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়।

	স্ফুটনাঙ্ক, °C	গলনাঙ্ক, °C	ঘনত্ব (0°C)
সাধারণ জল, H_2O	100°	0.00	0.9982
ভারী জল, D_2O	101.42°	3.82	1.1059

যে উৎস থেকেই জল সংগ্রহ করা হোক, তার মধ্যে ভারী জলের মিশেল থাকবেই। বৃষ্টি জল, নদী জল, বরফ, দুধে মিশ্রিত জল, আমাদের দেহাভ্যন্তরের জল, সর্বত্রই দুই রকমের জল মিশে আছে। জীবকোষে নানা রকম বিক্রিয়া ঘটে এবং সেসব বিক্রিয়াতে

জল অংশ নেয়। কি ধরনের পরিবর্তন দেহাভ্যন্তরে হচ্ছে সেটা জানার জন্যে বিজ্ঞানীরা অনেক সময় পানীয়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণে ভারী জল মিশিয়ে দেন। পরে বিশ্লেষণ করে দেখা হয় কোথায় কোথায় ভারী হাইড্রোজেন-জাত পদার্থ রয়েছে। সেই থেকে বিক্রিয়ার পদ্ধতি অনুধাবন করা সহজ হয়।

বর্তমানে ভারীজলের চাহিদা সবচেয়ে বেশী পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে। ইউরেনিয়ামের একটি আইসোটোপ ^{235}U। এই পরমাণুকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে এর কেন্দ্রটি ভেঙে যায়, এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় বেরিয়াম ও ক্রিপটনের। তার সঙ্গে বের হয় ২/৩ টি নিউট্রন ও প্রচুর তাপ। এই নিউট্রনগুলি যদি আবার নতুন ^{235}U-কে ভাঙে তাহলে এই ধ্বংস অবিরত চলতে থাকবে। ফলে, এক শৃংখল-অভিক্রিয়া (chain reaction) মুহূর্তের মধ্যে ঘটতে পারে। কিন্তু যে নিউট্রন-গুলো বেরিয়ে আসে সেগুলো খুব শক্তিশালী বা তেজী। এই তেজী নিউট্রন ^{235}U-কে ভাঙার উপযোগী নয়। সুতরাং ঐসকল নিউট্রনের শক্তিটা স্তিমিত করে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই কাজে ভারীজল বিশেষ সাহায্য করে। পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগাতে হলে শৃংখল-অভিক্রিয়াটিকে সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করা অবশ্যই দরকার। ভারীজল ব্যবহার করে নিউট্রনগুলোর শক্তি মন্দীভূত করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই জন্য অ্যাটমিক-রিঅ্যাকটরে ভারী জল প্রয়োজন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ফের্মি (Fermi) যখন চিকাগোতে এরকম শৃংখলা-বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম হন, সেই সময়েই ব্রিটিশ ও আমেরিকান সেনাধ্যক্ষেরা পারমাণবিক বোমা উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এমন সময় এঁরা জানতে পেরেছিলেন জার্মানী নাজী-অধিকৃত নরওয়েতে একটি ল্যাবরেটরীতে প্রায় একশ গ্যালন ভারী জল উৎপাদন করে সংগৃহীত করে রেখেছে। এই ভারী জল যে পারমাণবিক বিস্ফোরণের নিয়ন্ত্রক হিসেবে ব্যবহৃত হবে তা নিঃসন্দেহ। অতি সঙ্গোপনে এবং অত্যন্ত বিপদ-সংকুল অবস্থায় ব্রিটিশ নৌবাহিনী এক অভিযান চালিয়ে (1942) এই 100 গ্যালন ভারী জল কেড়ে নিয়ে আসে। এরকম অভিযান নৌবাহিনীর ইতিহাসেও বিরল।

কত নামে জল পরিচিত—অপ, অম্বু, উদক, তোয়, নীর, বারি, সলিল। পৃথিবীর অসংখ্য বস্তুর মধ্যে জলের তুলনা নেই। এর প্রাচুর্য, এর ঐশ্চর্য, এর রূপান্তর, এর ক্ষমতা, এর বিচিত্র স্বভাব —সবই বিস্ময়কর। জল বিধাতার এক অপরূপ সৃষ্টি। জলেই প্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল, পৃথিবীতে প্রাণমণ্ডলের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে জলের উপরে। জল না থাকলে জীবজগতের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। জলই চক্রীয় পরিক্রমায় তার বাষ্পের মাধ্যমে পৃথিবীর তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে জীবনধারণের উপযোগী করে রেখেছে। পৃথিবীর সৌন্দর্যের মূলেও জল। পত্রপুষ্প দিয়ে সাজিয়ে বসুন্ধরাকে শস্যশ্যামলা করে রেখেছে জল। আকাশের আশ্চর্য রঙের খেলা সম্ভব হয়েছে জলজ মেঘের জন্য।

পূর্ণ পয়ঃকুম্ভ আমাদের মঙ্গলচিহ্ন, জলকে নমস্কার।

———